সাধনা।

মাসিক পত্রিকা।

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক
সম্পাদিত।

প্রথম বর্ষ।

দ্বিতীয় ভাগ।

কলিকাতা

আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে

শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

৫৫নং অপার চিৎপুর রোড।

১২৯৯ সাল।

আগে চল্ আগে চল্ ভাই!
পড়ে' থাকা পিছে, মরে' থাকা মিছে,
বেঁচে মরে' কিবা ফল ভাই
আগে চল্ আগে চল্ ভাই!
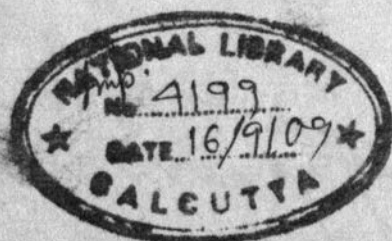
মাসের সূচিপত্র ॥

শুদ্ধিপত্র।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৭২	৪	আলোকে।	আলোকে
২২৮	১৫	সেই	স্নেহ
৩৭৯	১৩	সঙ্গীত	সঙ্গী ও
৩৮৬	১১	ভাইরে,	বাহিরে
৪৩১	১০	জলে	স্বর্গে

গত ভাদ্র ও আশ্বিন মাসের সাধনায় "গোবিন্দদাস" শীর্ষক প্রবন্ধে শ্রীনিবাস আচার্য্যের পুত্র "গীতগোবিন্দ" ভ্রমক্রমে এইরূপ ছাপা হইয়াছে। "গীতগোবিন্দ" না হইয়া "গতিগোবিন্দ" হইবে।

যে ভুলগুলি থাকায় অর্থবোধের বিশেষ ব্যাঘাত ঘটিবার সম্ভাবনা সেইগুলি সংশোধিত হইল অন্যান্য ত্রুটি পাঠক মহাশয়েরা সংশোধন করিয়া লইবেন

সূচিপত্র।

বিষয়।	লেখক।	পৃষ্ঠা।
সচেতন ও অচেতন আত্মা	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৬৬
আধুনিক মস্তিষ্কতত্ত্ব ও ফ্রেণলজি	শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৬৯
জাপানী সভ্যতা	শ্রীবলেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৭৫
সার লেপেল্ গ্রিফিন্	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	২৭৯
বুনিয়াদী জমিদারদিগের অধঃপতন	শ্রীসুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর	২৮২
সম্মোহনতত্ত্ব	শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর	৩৯১
ভাষা শিখিবার হদিশ	শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর	৩৯৬
দন্ত-রক্ষা	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর	৪০১
কিরূপে গল্প তৈরি হয়	শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর	৫১৪
বাল্যবিবাহ	শ্রীসুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৪০৬
মধ্য আসিয়ায় রুষ	শ্রীনীরোদচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	৫০৯
সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১০১, ২৮৬, ৪৪২
হিং টিং ছট্	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৯৩

অশুদ্ধশোধন।

শ্রীযুক্ত বাবু সখারাম গণেশ দেউস্কর মহাশয়ের দাক্ষিণাত্যে আর্য্য উপনিবেশ প্রবন্ধের আবশ্যকীয় ভ্রম সংশোধন।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৫২৮	১৯	রষ্টি	রঠ্ঠি
,,	,,	রষ্ঠ	রঠ্ঠ
,,	,,	মহারষ্ঠ	মহারঠ্ঠ
৫২৯	১১	জাতিপুগ	জাতিপুষ্প
৫৩০	৫	ও	বা
৫৩১	১৮	১৯০০+৪৬=১৯৪৬	১৯০০+৩৬=১৯৩৬
৫৩৩	১৪	ইর্ষাণাং	বর্ষাণাং
৫৩৫	৬ (নোট)	৯২৮০	৯০০০
ঐ	৭ (ঐ)	ততস্ত্রেতাণুযুগ্মং	ততস্ত্রেতাযুগং
ঐ	৮ (ঐ)	স্ত্রয়ী	ত্রয়ী

সাধনা।

আদিম আর্য্য-নিবাস।

লেখাপড়া শিখিয়া আমাদের অনেকেই মা সরস্বতীর কাছে আবেদন করিয়া থাকেন

> যে বিদ্যা দিয়েছ মাগো ফিরে তুমি লও,
> কাগজ কলমের কড়ি আমায় ফিরে দাও।

মা সরস্বতী অনেক সময়ে তাঁহাদের প্রার্থনানুসারে বিদ্যা ফিরাইয়া লন, কিন্তু কড়ি ফিরাইয়া দেন না।

অনেক বিদ্যা যাহা মাথা খুঁড়িয়া মাথায় প্রবেশ করাইতে হইয়াছিল হঠাৎ নোটিস পাওয়া যায়, সেগুলা মিথ্যা, আবার মাথা খুঁড়িয়া তাহাদিগকে বাহির করা দায় হইয়া উঠে। শতদল-বাসিনী যদি ইংরাজ আইনের বাধ্য হইতেন তবে উকীলের পরামর্শ লইয়া তাঁহার নিকট হইতে খেসারতের দাবী করা যাইতে পারিত। জনসমাজে লক্ষ্মীরই চাঞ্চল্য অপবাদ প্রচার হইয়াছে কিন্তু তাঁহার সপত্নীর যে নিতান্ত অটল স্বভাব এমন কোন লক্ষণ দেখা যায় না।

বাল্যকালে শিক্ষা করিয়াছিলাম মধ্য এসিয়ার কোন এক স্থানে আর্য্যদিগের আদিম বাসস্থান ছিল। সেখান হইতে একদল য়ুরোপে এবং একদল ভারতবর্ষে ও পারস্যে যাত্রা করে। কতক-

গুলি আসিয়াবাসী ও য়ুরোপীয় জাতির ভাষার সাদৃশ্য দ্বারা ইহার প্রমাণ হইয়াছে।

কথাটা মনে রাখিবার একটা সুবিধা ছিল। সূর্য্য পূর্ব্ব দিক হইতে পশ্চিমে যাত্রা করে। শ্বেতাঙ্গ আর্য্যগণও সেই পথ অনুসরণ করিয়াছেন এবং পূর্ব্বাচলের কাছেও দুই একটি মলিন জ্যোতিরেখা রাখিয়া গিয়াছেন।

কিন্তু উপমা যতই সুন্দর হোক তাহাকে যুক্তি বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। আজকাল ইংলণ্ড ফ্রান্স ও জর্ম্মানিতে বিস্তর পুরাতত্ত্ববিৎ উঠিয়াছেন, তাঁহারা বলেন য়ুরোপই আর্য্যদের আদিম বাসস্থান, কেবল একদল কোন বিশেষ কারণে এসিয়ায় আসিয়া পড়িয়াছিল।

ইহাঁদের দল প্রতিদিন যেরূপ পুষ্টিলাভ করিতেছে তাহাতে ।শ মনে হইতেছে আমাদের পুত্রপৌত্রগণ প্রাচীন আর্য্যদের সম্ব. স্বতন্ত্র পাঠ মুখস্থ করিতে আরম্ভ করিবেন এবং আমাদের ধারণাকে একটা বহুকেলে ভ্রম বলিয়া অবজ্ঞা করিতে ছাড়িবেননা।

আর্য্যদিগের পশ্চিমযাত্রা সম্বন্ধে ইংলণ্ডে ল্যাথাম্ সাহেব সর্ব্বপ্রথমে আপত্তি উত্থাপন করেন।

তিনি বলেন শাখা হইতে গুঁড়ি হয় না, গুঁড়ি হইতেই শাখা হয়। য়ুরোপেই যখন অধিকাংশ আর্য্যজাতির বাসস্থান দেখা যাইতেছে তখন সহজেই মনে হয় য়ুরোপেই মোট জাতটার উদ্ভব হইয়াছে এবং পারস্য ভারতবর্ষে তাহার একটা শাখা প্রসারিত হইয়াছে মাত্র।

মার্কিন্ ভাষাতত্ত্ববিৎ হুইট্নি সাহেব বলেন—আর্য্যদিগের আদিম নিবাস সম্বন্ধে পৌরাণিক উপাখ্যান, ইতিহাস অথবা ভাষা আলোচনা দ্বারা কো সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার কোন

পথ নাই। অতএব মধ্যএসিয়ায় আর্য্যদের বাসস্থান নিরূপণ করা নিতান্তই কপোলকল্পিত অনুমান।

জর্ম্মান্ পণ্ডিত বেন্‌ফি সাহেব বলেন, এসিয়াই আর্য্যদিগের প্রথম জন্মভূমি বলিয়া স্থির করিবার একটি কারণ ছিল। বহুদিন হইতে একটা সংস্কার চলিয়া আসিতেছে যে, এসিয়াতেই মানবের প্রথম উৎপত্তি হয়; অতএব আর্য্যগণ যে, সেইখান হইতেই অন্যত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে ইহার বিশেষ প্রমাণ লওয়া কেহ আবশ্যক মনে করিত না। কিন্তু ইতিমধ্যে য়ুরোপের ভূস্তরে বহু প্রাচীন মানবের বাসচিহ্ন আবিষ্কৃত হইয়াছে, এইজন্য সেই পূর্ব্বসংস্কার এখন অমূলক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহা ছাড়া ভাষাতত্ত্ব হইতে তিনি একটা বিরোধী প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন। তাহার মর্ম্ম এই।—সংস্কৃত ও পারসিকের সহিত গ্রীক লাটিন জর্ম্মান প্রভৃতি য়ুরোপীয় ভাষায় গার্হস্থ্য সম্পর্ক এবং অনেক পশু ও প্রাকৃতিক বস্তুর নামের ঐক্য আছে, সেই ভাষাগত ঐক্যের উপর নির্ভর করিয়াই এই ভিন্নভাষীদিগের একজাতিত্ব স্থির হইয়াছে। কেবল তাহাই নহে; নানা স্থানে বিভক্ত হইবার পূর্ব্বে আর্য্যগণ যখন একত্রে বাস করিতেন, তখন তাঁহাদের কিরূপ অবস্থা ছিল ভাষা তুলনা করিয়া তাহার আভাস পাওয়া যায়। যেমন, যদি দেখা যায় সংস্কৃত ও য়ুরোপীয় ভাষার লাঙ্গলের নামের সাদৃশ্য আছে তবে স্থির করা যায় যে আর্য্যগণ বিচ্ছিন্ন হইবার পূর্ব্বেই চাষ আরম্ভ করিয়াছিলেন, তেমনি যদি দেখা যায় কোন একটা বস্তুর নাম উভয় ভাষায় পৃথক, তবে অনুমান করা যাইতে পারে যে ভিন্ন হইবার পরে তৎসম্বন্ধে তাঁহাদের পরিচয় ঘটিয়াছে। সেই যুক্তি অবলম্বন করিয়া বেন্‌ফি বলেন, সংস্কৃত ভাষায় সিংহ শব্দ যে ধাতু হইতে

উৎপন্ন হইয়াছে সে ধাতু য়ুরোপীয় কোন ভাষায় নাই। অপর পক্ষে গ্রীকৃগণ সিংহের নাম হিব্রু ভাষা হইতে ধার করিয়া লইয়াছেন (গ্রীক লিস্, হিব্রু লাইশ্)। অতএব এ কথা বলা যাইতে পারে যে আর্য্যগণ একত্র থাকিবার সময় সিংহের পরিচয় পান নাই। সম্ভবতঃ গ্রীক্ লিস্ ও লিওন্ শব্দের ন্যায় সংস্কৃত সিংহ শব্দও তৎকালীন কোন অনার্য্য ভাষা হইতে সংগৃহীত। অথবা পশুরাজের গর্জ্জনের অনুকরণেও নূতন নামকরণ অসম্ভব নহে। যাহাই হোক্ এসিয়াই যদি আর্য্যদিগের আদিম নিবাস হইত তবে সিংহ শব্দের ধাতু য়ুরোপীয় আর্য্য ভাষাতেও পাওয়া যাইত। উষ্ট্র হস্তী এবং ব্যাঘ্র শব্দ সম্বন্ধেও এই কথা খাটে।

এদিকে আবার মানবতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন, শ্বেতবর্ণ মানবেরা একটি বিশেষ জাতীয় এবং এই জাতীয় মানব য়ুরোপেই দেখা যায়, এসিয়ায় নহে। প্রাচীন বর্ণনা এবং বর্ত্তমান দৃষ্টান্ত দ্বারা জানা যায় যে আদিম আর্য্যগণ শ্বেতাঙ্গ ছিলেন এবং বর্ত্তমান আর্য্যদের অধিকাংশই শ্বেতবর্ণ। অতএব য়ুরোপেই এই শ্বেতজাতীয় মনুষ্যের উৎপত্তি অধিকতর সঙ্গত বলিয়া বিবেচনা হয়।

লিওেন্শ্মিট্ বলেন, ভাষার ঐক্য ধরিয়া যে সমস্ত জাতিকে আর্য্য নামে অভিহিত করা হইতেছে মস্তকের গঠন ও শারীরিক পরিণতি অনুসারে তাহাদের আদিম আদর্শ য়ুরোপেই দেখা যায়। য়ুরোপীয়দের শারীরিক প্রকৃতি, দীর্ঘ জীবন এবং দুর্দ্ধর্ষ জীবনীশক্তি পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে আর্য্যজাতির প্রবলতম, প্রাচীনতম এবং গভীরতম মূল কোথায় পাওয়া যাইতে পারে। তাঁহার মতে ভারতবর্ষে ও এসিয়ার অন্যত্র আর্য্যগণ তত্রস্থ আদিম অধিবাসীদের সহিত অনেক পরিমাণে মিশ্রিত হইয়া শঙ্কর জাতিতে পরিণত হইয়াছে।

য়ুরোপের উত্তরাঞ্চলবাসী ফিন্ জাতি আর্য্যজাতি নহে। ভাষাতত্ত্ববিৎ কুনো সাহেব দেখাইয়াছেন, ফিন্ ভাষার বহুতর সংখ্যাবাচক শব্দ, সর্ব্বনাম শব্দ, এবং পারিবারিক সম্পর্কের নাম ইণ্ডোয়ুরোপীয় ধাতু হইতে উৎপন্ন। তাঁহার মতে এ সকল শব্দ যে ধার করিয়া লওয়া তাহা নহে; কোন এক সময়ে অতি প্রাচীনকালে উক্ত দুই জাতির পরস্পরসামীপ্যবশত কতকগুলি শব্দ ও ধাতু উভয়েরই সরকারী দখলে ছিল। ইহা হইতেও প্রমাণ হয় য়ুরোপই আর্য্যগণের আদিম বাসস্থান, সুতরাং ফিন্ জাতি তাঁহাদের প্রতিবেশী ছিল।

ইতিমধ্যে আবার একটা নূতন কথা অল্পে অল্পে দেখা দিতেছে, সেটা যদি ক্রমে পাকিয়া দাঁড়ায় তবে আবার প্রাচীন মতই বাহাল থাকিবার সম্ভাবনা।

সেমেটিক জাতি (আরব্য য়িহুদি প্রভৃতি জাতিরা যাহার অন্তর্গত) আর্য্যজাতির দলভুক্ত নয়, এতকাল এই কথা শুনিয়া আসিতেছিলাম। কিন্তু আজকাল দুই একজন করিয়া পুরাতত্ত্ববিৎ কোন কোন সেমেটিক শব্দের সহিত আর্য্য শব্দের সাদৃশ্য বাহির করিতেছেন। এবং কেহ কেহ এরূপ অনুমান করিতেছেন যে, সেমেটিকগণ হয় ত এককালে আর্য্যজাতির অন্তর্ভুক্ত ছিল; সর্ব্বাগ্রে তাহারাই বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল এই [illegible] তাহাদের সহিত অবশিষ্ট আর্য্যগণের সাদৃশ্য ক্রমশই ক্ষীণতর হইয়া আসিয়াছে। আর্য্যদিগের সহিত সেমেটিকদের সম্পর্ক স্থির হইয়া গেলে আদিমকালে উভয়ের একত্র এসিয়াবাসই অপেক্ষাকৃত সঙ্গত বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু এ মত এখনো পরিস্ফুট হয় নাই, অনুমানের মধ্যেই আছে।

আমরা বলি, আদিম বাসস্থান যেখানেই থাক্ কুটুম্বিতা যতই

বাড়ে ততই ভাল। এই এক আর্য্য সম্পর্কে পৃথিবীর অনেক বড় বড় জাতির সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ বাধিয়াছে। আরবিক ও য়িহুদিরা কম লোক নহে। তাহারা যদি জাতভাই হইয়া দাঁড়ায় সে ত সুখের বিষয়। বর্ণিত আছে যে দ্রৌপদী কর্ণকে দেখিয়া মনে করিতেন "যখন আমার সেই পঞ্চস্বামীই হইল, তখন কর্ণকে স্কন্ধ ধরিয়া ছয় স্বামী হইলেই মনের খেদ মিটিত; তাহা হইলে পৃথিবীতে আমার স্বামীর তুলনা মিলিত না।" আমাদেরও কতকটা সেই অবস্থা। ইংরাজ ফরাসী গ্রীক লাটিন ইহারা ত আমাদের খুড়তুতো ভাই, এখন ইহুদি মুসলমানেরাও যদি আমাদের আপনার হইয়া যায় তাহা হইলে পৃথিবীতে আমাদের আত্মীয় গৌরবের তুলনা মিলে না। তাহা হইলে আমাদের আর্য্যমাতার প্রথমজাত এই অজ্ঞাত পুত্র কর্ণও আমাদের চিরবৈরীশ্রেণী হইতে কুটুম্বশ্রেণীতে ভুক্ত হন।

একরাত্রি।

সুরবালার সঙ্গে একত্রে পাঠশালায় গিয়াছি, এবং বউ বউ খেলিয়াছি। তাহাদের বাড়িতে গেলে সুরবালার মা আমাকে বড় যত্ন করিতেন, এবং আমাদের দুজনকে একত্র করিয়া আপনা আপনি বলাবলি করিতেন "আহা, দুটিতে বেশ মানায়!" ছোট ছিলাম কিন্তু কথাটার অর্থ একরকম বুঝিতে পারিতাম। সুরবালার প্রতি যে সর্ব্বসাধারণের অপেক্ষা আমার কিছু বিশেষ দাবী ছিল সে ধারণা আমার মনে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল। সেই অধিকারমদে মত্ত হইয়া তাহার প্রতি যে আমি শাসন

এবং উপদ্রব না করিতাম তাহা নহে। সেও সহিষ্ণুভাবে আমার সকল রকম ফর্‌মাস্‌ খাটিত এবং শাস্তি বহন করিত। পাড়ায় তাহার রূপের প্রশংসা ছিল—কিন্তু বর্ব্বর বালকের চক্ষে সে সৌন্দর্য্যের কোন গৌরব ছিল না—আমি কেবল জানিতাম, সুরবালা আমারই প্রভুত্ব স্বীকার করিবার জন্য পিতৃগৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছে এই জন্য সে আমার বিশেষ রূপ অবহেলার পাত্র।

আমার পিতা চৌধুরী জমিদারের নায়েব ছিলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল আমার হাতটা পাকিলেই আমাকে জমিদারী সেরেস্তার কাজ শিখাইয়া একটা কোথাও গোমস্তাগিরিতে প্রবৃত্ত করাইয়া দিবেন। কিন্তু আমি মনে মনে তাহাতে নারাজ ছিলাম। আমাদের পাড়ার নীলরতন যেমন কলিকাতায় পালাইয়া লেখা পড়া শিখিয়া কালেক্টার সাহেবের নাজির হইয়াছে, আমারও জীবনের লক্ষ্য সেইরূপ অত্যুচ্চ ছিল—কালেক্টারের নাজির না হইতে পারি ত জজ আদালতের হেড্‌ ক্লার্ক হইব ইহা আমি মনে মনে নিশ্চয় স্থির করিয়া রাখিয়াছিলাম। সর্ব্বদাই দেখিতাম আমার বাপ উক্ত আদালতজীবীদিগকে অত্যন্ত সম্মান করিতেন—নানা উপলক্ষ্যে মাছটা তরকারীটা টাকাটা সিকেটা লইয়া যে তাঁহাদের পূজার্চ্চনা করিতে হইত তাহাও শিশুকাল হইতে আমার জানা ছিল, এই জন্য আদালতের ছোট কর্ম্মচারী, এমন কি, পেয়াদাগুলাকে পর্য্যন্ত হৃদয়ের মধ্যে খুব একটা সম্ভ্রমের আসন দিয়াছিলাম। ইঁহারা আমাদের বাঙ্গলা দেশের পূজ্য দেবতা। তেত্রিশ কোটির ছোট ছোট নূতন সংস্করণ। বৈষয়িক সিদ্ধিলাভ সম্বন্ধে স্বয়ং সিদ্ধিদাতা গণেশ অপেক্ষা ইঁহাদের প্রতি লোকের আন্তরিক

নির্ভর ঢের বেশি, সুতরাং পূর্ব্বে গণেশের যাহা কিছু পাওনা ছিল আজকাল ইঁহারাই তাহা সমস্ত পাইয়া থাকেন।

আমিও নীলরতনের দৃষ্টান্তে উৎসাহিত হইয়া এক সময় বিশেষ সুবিধাযোগে কলিকাতায় পালাইয়া গেলাম। প্রথমে গ্রামের একটি আলাপী লোকের বাসায় ছিলাম, তাহার পরে বাপের কাছ হইতেও কিছু কিছু অধ্যয়নের সাহায্য পাইতে লাগিলাম। লেখাপড়া যথানিয়মে চলিতে লাগিল।

ইহার উপরে আবার সভা সমিতিতেও যোগ দিতাম। দেশের জন্য হঠাৎ প্রাণ বিসর্জ্জন করা যে, আশু আবশ্যক এ সম্বন্ধে আমার সন্দেহ ছিল না। কিন্তু কি করিয়া উক্ত দুঃসাধ্য কাজ করা যাইতে পারে আমি জানিতাম না, এবং কেহ দৃষ্টান্তও দেখাইত না। কিন্তু তাহা বলিয়া উৎসাহের কোন ত্রুটি ছিল না। আমরা পাড়াগেঁয়ে ছেলে, ইঁচড়েপাকা কলিকাতার মত সকল জিনিষকেই পরিহাস করিতে শিখি নাই সুতরাং আমাদের নিষ্ঠা অত্যন্ত দৃঢ় ছিল। আমাদের সভার কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা বক্তৃতা দিতেন, আর আমরা চাঁদার খাতা লইয়া না খাইয়া দুপুর রৌদ্রে টোঁটোঁ করিয়া বাড়ি বাড়ি ভিক্ষা ফিরিয়া বেড়াইতাম, রাস্তার ধারে দাঁড়াইয়া বিজ্ঞাপন বিলি করিতাম, সভাস্থলে গিয়া বেঞ্চি চৌকি সাজাইতাম, দলপতির নামে কেহ একটা কথা বলিলে কোমর বাঁধিয়া মারামারি করিতে উদ্যত হইতাম। সহরের ছেলেরা এই সকল লক্ষণ দেখিয়া আমাদিগকে বাঙ্গাল বলিত।

নাজির সেরেস্তাদার হইতে আসিয়াছিলাম, কিন্তু ম্যাট্‌সীনি গারিবাল্‌ডি হইবার আয়োজন করিতে লাগিলাম। এমন সময়ে আমার পিতা এবং সুরবালার পিতা একমত হইয়া সুরবালার সহিত আমার বিবাহের জন্য উদ্যোগী হইলেন। আমি পনেরো

সের বয়সের সময় কলিকাতায় পলাইয়া আসি তখন সুর-
লার বয়স ছিল আট ; এখন আমি আঠারো। পিতার মতে
মার বিবাহের বয়স ক্রমে উত্তীর্ণ হইয়া যাইতেছে। কিন্তু
দিকে আমি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি আজীবন বিবাহ না
রিয়া স্বদেশের জন্য মরিব—বাপকে বলিলাম বিদ্যাভ্যাস
পূর্ণ সমাধা না করিয়া বিবাহ করিব না। দুই চারি মাসের
ধ্য খবর পাইলাম উকীল রামলোচন বাবুর সহিত সুরবালার
বাহ হইয়া গিয়াছে। পতিত ভারতের চাঁদা আদায় কার্য্যে
স্ত ছিলাম, এ সংবাদ অত্যন্ত তুচ্ছ বোধ হইল।

এণ্ট্রেন্স্ পাশ করিয়াছি, ফাষ্ট্ আর্ট্স্ দিব, এমন সময়
তার মৃত্যু হইল। সংসারে কেবল আমি একা নই, মাতা এবং
টি ভগিনী আছেন। সুতরাং কালেজ ছাড়িয়া কাজের সন্ধানে
ফিরিতে হইল। বহুচেষ্টায় নওয়াখালি বিভাগের একটি ছোট
সহরে এণ্ট্রেন্স্ স্কুলের সেকেণ্ড্ মাষ্টারি পদ প্রাপ্ত হইলাম।

মনে করিলাম, আমার উপযুক্ত কাজ পাইয়াছি। উপদেশ
এবং উৎসাহ দিয়া এক একটি ছাত্রকে ভাবী ভারতের এক
একটি সৈনিক করিয়া তুলিব।

কাজ আরম্ভ করিয়া দিলাম। দেখিলাম ভাবী ভারতবর্ষ
অপেক্ষা আসন্ন এগ্‌জামিনের তাড়া ঢের বেশি। ছাত্রদিগকে
গ্রামার অ্যাল্‌জেব্রার বহির্ভূত কোন কথা বলিলে হেড্‌মাষ্টার
াগ করে। মাসদুয়েকের মধ্যে আমারও উৎসাহ নিস্তেজ
হইয়া আসিল। আমাদের মত প্রতিভাহীন লোক ঘরে বসিয়া
নানা রূপ কল্পনা করে, অবশেষে কার্য্যক্ষেত্রে নামিয়া ঘাড়ে
লাঙ্গল বহিয়া পশ্চাৎ হইতে ল্যাজমলা খাইয়া নতশিরে
হিষ্ণু ভাবে প্রাত্যহিক মাটিভাঙ্গার কাজ করিয়া সন্ধ্যাবেলায়

একপেট জাব্‌না খাইতে পাইলেই সন্তুষ্ট থাকে, লক্ষে ঝে
আর উৎসাহ থাকে না।

অগ্নিদাহের আশঙ্কায় একজন করিয়া মাষ্টার স্কুলের ঘ
তেই বাস করিত। আমি একা মানুষ, আমার উপরেই ে
ভার পড়িয়াছিল। স্কুলের বড় আটচালার সংলগ্ন একটি চাল
আমি বাস করিতাম। স্কুলঘরটি লোকালয় হইতে কিছু দূে
একটি বড় পুষ্করিণীর ধারে। চারিদিকে সুপারি নারিবে
এবং মাদারের গাছ, এবং স্কুল গৃহের প্রায় গায়েই ছুটা প্রক
বৃদ্ধ নিমগাছ গায়ে গায়ে সংলগ্ন হইয়া ছায়া দান করিতেছে।

একটা কথা এতদিন উল্লেখ করি নাই, এবং এতদিন উল্লে
যোগ্য বলিয়া মনে হয় নাই। এখানকার সরকারী উকী
রামলোচন রায়ের বাসা আমাদের স্কুল ঘরের অনতিদূরে। এব
তাঁহার সঙ্গে যে তাঁহার স্ত্রী—আমার বাল্যসখী সুরবালা—ছিল
তাহা আমার জানা ছিল।

রামলোচন বাবুর সঙ্গে আমার আলাপ হইল। সুরবালার
সহিত বাল্যকালে আমার জানাশোনা ছিল, তাহা রামলোচন
বাবু জানিতেন কি না জানি না, আমিও নূতন পরিচয়ে সে সম্বন্ধে
কোন কথা বলা সঙ্গত বোধ করিলাম না। এবং সুরবালা,
যে, কোন কালে আমার জীবনের সঙ্গে কোনরূপে জড়িত ছিল
সে কথা আমার ভাল করিয়া মনে উদয় হইত না।

একদিন ছুটির দিনে রামলোচন বাবুর বাসায় তাঁহার সহিত
সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছি। মনে নাই কি বিষয়ে আলোচনা হই-
তেছিল, বোধ করি বর্ত্তমান ভারতবর্ষের দুরবস্থা সম্বন্ধে। তিনি
যে সে জন্য বিশেষ চিন্তিত এবং ম্রিয়মাণ ছিলেন তাহা নহে,
কিন্তু বিষয়টা এমন যে, তামাক টানিতে টানিতে এ সম্বন্ধে ঘণ্টা

থানেক দেড়েক অনর্গল সখের দুঃখ করা যাইতে পারে। এমন সময় পাশের ঘরে অত্যন্ত মৃদু একটু চুড়ির টুংটাং কাপড়ের একটুখানি খস্‌খস্‌ এবং পায়েরও একটুখানি শব্দ শুনিতে পাইলাম; বেশ বুঝিতে পারিলাম জানালার ফাঁক দিয়া কোন কৌতূহলপূর্ণনেত্র আমাকে নিরীক্ষণ করিতেছে। তৎক্ষণাৎ দু'খানি চোখ আমার মনে পড়িয়া গেল—বিশ্বাস, সরলতা এবং শৈশব প্রীতিতে ঢলঢল দু'খানি বড় বড় চোখ, কালো কালো তারা, ঘনকৃষ্ণ পল্লব, স্থিরস্নিগ্ধ দৃষ্টি। সহসা হৃৎপিণ্ডকে কে যেন একটা কঠিন মুষ্টির দ্বারা চাপিয়া ধরিল, এবং বেদনায় ভিতরটা টন্‌টন্‌ করিয়া উঠিল।

বাসায় ফিরিয়া আসিলাম কিন্তু সেই ব্যথা লাগিয়া রহিল। লিখি পড়ি যাহা করি কিছুতে মনের ভার দূর হয় না; মনটা সহসা একটা বৃহৎ বোঝার মত হইয়া বুকের শিরা ধরিয়া ঝুলিতে লাগিল। সন্ধ্যাবেলায় একটু স্থির হইয়া ভাবিতে লাগিলাম, এমনটা হইল কেন? মনের মধ্যে হইতে উত্তর আসিল, তোমার সে সুরবালা কোথায় গেল! আমি প্রত্যুত্তরে বলিলাম—আমি ত তাহাকে ইচ্ছা করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছি। সে কি চিরকাল আমার জন্যে বসিয়া থাকিবে!—মনের ভিতরে কে বলিল—তখন যাহাকে ইচ্ছা করিলেই পাইতে পারিতে এখন মাথা খুঁড়িয়া মরিলেও তাহাকে একবার চক্ষে দেখিবার অধিকারটুকুও পাইবে না! সেই শৈশবের সুরবালা তোমার যত কাছেই থাকুক্‌, তাহার চুড়ির শব্দ শুনিতে পাও, তাহার মাথাঘষার গন্ধ অনুভব কর, কিন্তু মাঝখানে বরাবর একখানি করিয়া দেয়াল থাকিবে। আমি বলিলাম তা থাক্‌না, সুরবালা আমার কে!—উত্তর শুনিলাম, সুরবালা আজ তোমার কেহই নয়, কিন্তু সুরবালা তোমার কি না হইতে পারিত!

সে কথা সত্য। সুরবালা আমার কি না হইতে পারিত? আমার সব চেয়ে অন্তরঙ্গ, আমার সব চেয়ে নিকটবর্ত্তী, আমার জীবনের সমস্ত সুখদুঃখভাগিনী হইতে পারিত, সে আজ এত দূর, এত পর, আজ তাহাকে দেখা নিষেধ, তাহার সঙ্গে কথা কওয়া দোষ, তাহার বিষয়ে চিন্তা করা পাপ! আর, একটা রামলোচন কোথাও কিছু নাই হঠাৎ আসিয়া উপস্থিত; কেবল গোটাদুয়েক মুখস্থ মন্ত্র পড়িয়া সুরবালাকে পৃথিবীর আর সকলের নিকট হইতে এক মুহূর্ত্তে ছোঁ মারিয়া লইয়া গেল।

আমি মানবসমাজে নূতন নীতি প্রচার করিতে বসি নাই, সমাজ ভাঙ্গিতে আসি নাই, বন্ধন ছিঁড়িতে চাই না। আমি আমার মনের প্রকৃত ভাবটা ব্যক্ত করিতেছি মাত্র। আপন মনে যে সকল ভাব উদয় হয় তাহার কি সবই বিবেচনা-সঙ্গত! রামলোচনের গৃহভিত্তির আড়ালে যে সুরবালা বিরাজ করিতেছিল সে যে রামলোচনের অপেক্ষাও বেশি করিয়া আমার এ কথা আমি কিছুতেই মন হইতে তাড়াইতে পারিতেছিলাম না। এরূপ চিন্তা নিতান্ত অসঙ্গত এবং অন্যায় তাহা স্বীকার করি কিন্তু অস্বাভাবিক নহে।

এখন হইতে আর কোন কাজে মনঃসংযোগ করিতে পারি না। দুপুর বেলায় ক্লাশে যখন ছাত্রেরা গুন্‌গুন্ করিতে থাকিত, বাহিরে সমস্ত ঝাঁ ঝাঁ করিত, ঈষৎ উত্তপ্ত বাতাসে নিমগাছের পুষ্পমঞ্জরীর সুগন্ধ বহন করিয়া আনিত, তখন ইচ্ছা করিত— কি ইচ্ছা করিত জানি না এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি ভারতবর্ষের এই সমস্ত ভাবী আশাস্পদদিগের ব্যাকরণের ভ্রম সংশোধন করিয়া জীবন যাপন করিতে ইচ্ছা করিত না।

স্কুলের ছুটি হইয়া গেলে আমার বৃহৎ ঘরে একলা থাকিতে

মনকেত না, অথচ কোন ভদ্রলোক দেখা করিতে আসিলেও অসহ্যবোধ হইত। সন্ধ্যাবেলায় পুষ্করিণীর ধারে সুপারি নারি-কো অর্থহীন মর্ম্মর ধ্বনি শুনিতে শুনিতে ভাবিতাম, মনুষ্য-সম একটা জটিল ভ্রমের জাল। ঠিক সময়ে ঠিক কাজ করিতে কারো মনে পড়ে না, তাহার পর বেঠিক সময়ে বেঠিক বা লইয়া অস্থির হইয়া মরে। তোমার মত লোক সুরবালার স্বামী হইয়া বুড়াবয়স পর্য্যন্ত বেশ সুখে থাকিতে পারিত, তুকিনা হইতে গেলে গারিবাল্ডি, এবং হইলে শেষে একটি পাগেঁয়ে ইস্কুলের সেকেণ্ড মাষ্টার! আর রামলোচন রায় উক, তাহার বিশেষ করিয়া সুরবালারই স্বামী হইবার কোন জরু আবশ্যক ছিল না, বিবাহের পূর্ব্বমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তাহার পক্ষে সুরলাও যেমন ভবশঙ্করীও তেমন, সেই কিনা কিছুমাত্র না ভায়া চিন্তিয়া বিবাহ করিয়া সরকারী উকীল হইয়া দিব্য টাকা রোজগার করিতেছে—যেদিন দুধে ধোঁয়ার গন্ধ হয় সে দিন সুরবালাকে তিরস্কার করে, যে দিন মন প্রসন্ন থাকে সেদিন সুরবালার জন্য গহনা গড়াইতে দেয়। বেশ মোটা-সোটা, চাপকান-পরা, কোন অসন্তোষ নাই, পুষ্করিণীর ধারে বসিয়া আকাশের তারার দিকে চাহিয়া কোন দিন হাহুতাশ করিয়া সন্ধ্যাযাপন করেনা।

রামলোচন একটা বড় মকদ্দমায় কিছুকালের জন্য অন্যত্র গিয়াছে। আমার স্কুলঘরে আমি যেমন একা ছিলাম সেদিন সুরবালার ঘরেও সুরবালা বোধ করি সেইরূপ একা ছিল।

মনে আছে সেদিন সোমবার। সকাল হইতেই আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া আছে। বেলা দশটা হইতে টিপ্‌টিপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ করিল। আকাশের ভাবগতিক দেখিয়া হেড

মাষ্টার সকাল সকাল স্কুলের ছুটি দিলেন। খণ্ড খণ্ড কালো
যেন একটা কি মহা আয়োজনে সমস্ত দিন আকাশময় আনাগো
করিয়া বেড়াইতে লাগিল। তাহার পরদিন বিকালের দি
মুষলধারে বৃষ্টি এবং সঙ্গে সঙ্গে ঝড় আরম্ভ হইল। যত রা
হইতে লাগিল বৃষ্টি এবং ঝড়ের বেগ বাড়িতে চলিল। প্রথ
পূর্ব্বদিক হইতে বাতাস বহিতেছিল ক্রমে উত্তর এবং উত্তরপ
দিয়া বহিতে লাগিল। এ রাত্রে ঘুমাইবার চেষ্টা করা বৃ
মনে পড়িল এই দুর্য্যোগে সুরবালা ঘরে একলা আছে। আ-
দের স্কুলঘর তাহাদের ঘরের অপেক্ষা অনেক মজ্‌বুত। কতব
মনে করিলাম, তাহাকে স্কুলঘরে ডাকিয়া আনিয়া আমি পু-
রিণীর পাড়ের উপর রাত্রিযাপন করিব। কিন্তু কিছুতেই ন
স্থির করিয়া উঠিতে পারিলাম না।

রাত্রি যখন একটা দেড়টা হইবে হঠাৎ বানের ডাক শো
গেল—সমুদ্র ছুটিয়া আসিতেছে। ঘর ছাড়িয়া ছুটিয়া বা
হইলাম। সুরবালার বাড়ির দিকে চলিলাম। পথে আমাদে
পুষ্করিণীর পাড়—সে পর্য্যন্ত যাইতে না যাইতে আমার হাঁটু জ
হইল। পাড়ের উপরে যখন উঠিয়া দাঁড়াইলাম তখন দ্বিতী
আর একটা তরঙ্গ আসিয়া উপস্থিত হইল। আমাদের পুকুরে
পাড়ের একটা অংশ প্রায় দশ এগারো হাত উচ্চ হইবে।

পাড়ের উপরে আমিও যখন উঠিলাম, বিপরীত দিক হইতে
আর একটি লোকও উঠিল। লোকটি কে তাহা আমার সমস্ত
অন্তরাত্মা, আমার মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত বুঝিতে পারিল। এবং
সেও যে আমাকে জানিতে পারিল তাহাতে আমার সন্দেহ নাই।

আর সমস্ত জলমগ্ন হইয়া গেছে কেবল হাত পাঁচ ছয় দ্বীপের
উপর আমরা দুটি প্রাণী আসিয়া দাঁড়াইলাম। তখন প্রলয়

কাল, তখন আকাশে তারার আলো ছিল না, এবং পৃথিবীর সমস্ত প্রদীপ নিভিয়া গেছে—তখন একটা কথা বলিলেও ক্ষতি ছিল না—কিন্তু একটা কথাও বলা গেল না। কেহ কাহাকেও একটা কুশল প্রশ্নও করিল না।

কেবল দুজনে অন্ধকারের দিকে চাহিয়া রহিলাম। পদতলে গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ উন্মত্ত মৃত্যুস্রোত গর্জ্জন করিয়া ছুটিয়া চলিল। আজ সমস্ত বিশ্বসংসার ছাড়িয়া সুরবালা আমার কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। আজ আমি ছাড়া সুরবালার আর কেহ নাই। কবেকার সেই শৈশবে সুরবালা কোন্ এক জন্মান্তর কোন্ এক পুরাতন রহস্যান্ধকার হইতে ভাসিয়া এই সূর্য্য-চন্দ্রালোকিত লোকপরিপূর্ণ পৃথিবীর উপরে আমারই পার্শ্বে আসিয়া সংলগ্ন হইয়াছিল; আর আজ কতদিন পরে সেই আলোকময় লোকময় পৃথিবী ছাড়িয়া এই ভয়ঙ্কর জনশূন্য প্রলয়ান্ধকারের মধ্যে সুরবালা একাকিনী আমারই পার্শ্বে আসিয়া উপনীত হইয়াছে। জন্মস্রোতে সেই নবকলিকাকে আমার কাছে আনিয়া ফেলিয়াছিল, মৃত্যুস্রোতে সেই বিকশিত পুষ্পটিকে আমারই কাছে আনিয়া ফেলিয়াছে এখন কেবল আর একটা ঢেউ আসিলেই পৃথিবীর এই প্রান্তটুকু হইতে বিচ্ছেদের এই বৃন্তটুকু হইতে খসিয়া আমরা দুজনে এক হইয়া যাই।

সে ঢেউ না আসুক! স্বামীপুত্রগৃহধনজন লইয়া সুরবালা চিরদিন সুখে থাকুক্! আমি এই এক রাত্রে মহাপ্রলয়ের তীরে দাঁড়াইয়া অনন্ত আনন্দের আস্বাদ পাইয়াছি।

রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া আসিল—ঝড় থামিয়া গেল, জল নামিয়া গেল—সুরবালা কোন কথা না বলিয়া বাড়ি চলিয়া গেল, আমিও কোন কথা না বলিয়া আমার ঘরে গেলাম।

ভাবিলাম, আমি নাজিরও হই নাই, সেরেস্তাদারও হই নাই, গারিবাল্ডিও হই নাই, আমি এক ভাঙ্গা স্কুলের সেকেণ্ড মাষ্টার, আমার সমস্ত ইহজীবনে কেবল ক্ষণকালের জন্য একটি অনন্ত-রাত্রির উদয় হইয়াছিল—আমার পরমায়ুর সমস্ত দিনরাত্রির মধ্যে সেই একটি মাত্র রাত্রিই আমার তুচ্ছ জীবনের একমাত্র চরম সার্থকতা।

পাখী-ছাড়া।

(খোকাকে ক্রোড়ে লইয়া বসিয়া আছ? খোকার মা এই পথে আসিলে খোকাকে ছাড়িয়া দিও। অবশ্য খোকাবাবু ঝাঁপাইয়া জননীর উৎসঙ্গে আরোহণ করিবেন। "আঃ একদণ্ড ও সোয়াস্তি নাই" ইত্যাদি বাক্যে যখন সুন্দরী কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইবে তখন তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া এই কবিতাটি পাঠ করিও।)

১

তুমি কি গো হর, সখি, আমি কি অনঙ্গ?
সুন্দরি, শ্রী-অঙ্গে কেন ভ্রূকুটির ভঙ্গ?
পিঞ্জর খুলিয়া দিনু,
শিকলি কাটিয়া দিনু,
বনেতে উড়িয়া গেল বনের বিহঙ্গ—
সুন্দরি, শ্রী-অঙ্গে কেন ভ্রূকুটির ভঙ্গ?
পুষ্পিত-হরিত-পাতা
কোমল শ্যামল লতা
পুনঃ পেয়ে, বন-পাখী করে কত রঙ্গ!

ললিত হরিত শাখে
গগন-বিহারী ডাকে,
ভুলি পিঞ্জরের খেদ, ভুলিয়া আতঙ্ক!
কেন মিছে হও বাদী ?
আমি নহি অপরাধী—
পল্লব-বসনা শাখী আছিল উলঙ্গ,
পাখীর পরশে তার সার্থক উৎসঙ্গ!
আন্দোলিয়া শ্যামকায়,
চঞ্চল সমীর ধায়,—
রবিচ্ছায়া দেহে পড়ে; ফুলাইয়া অঙ্গ
হের, দেখ, সোহাগিনি, বিহগের রঙ্গ!
পিঞ্জর খুলিয়া দিনু
শিকলি কাটিয়া দিনু,
বনেতে উড়িয়া গেল বনের বিহঙ্গ—
সুন্দরি, শ্রীঅঙ্গে কেন ভ্রূকুটির ভঙ্গ ?
মিঠি মিঠি তব দিঠি,
গেল সখি কোথা সিটি,
যে আরসী হেরি হোত উদাসী কুরঙ্গ ?
কর, কর রোষহীন নয়ন-অপাঙ্গ।
চারিধারে মুক্তাকাশ,
মলয়া বহিছে বাস,
চারিধারে উছলিছে সৌরভ তরঙ্গ!
আধা মোদা, আধা খোলা
নয়নে চাহিছে ভোলা;
ক্লান্তি, শ্রান্তি বিসরিছে; জুড়াইছে অঙ্গ।

সুন্দরি, শ্রীঅঙ্গে কেন ভ্রূকুটির ভঙ্গ ?
দেখ, দেখ, স্নেহময়ি,
নীড়েতে পশিল ওই
বনচর ; হোথা নাই ভাবনা-ভুজঙ্গ।
হাসিয়ে পাতে না ফাঁশ,
কিরাত, নয়ন-ত্রাস ;
নিরিবিলি বনস্থলী, বিহীন-আতঙ্গ !
দেবভোগ্য ক্ষীর-ফল,
সুধা ঢালে অবিরল ;
উধাও অরণ্য পানে সাধে কি বিহঙ্গ ?
সুন্দরি, শ্রীঅঙ্গে কেন ভ্রূকুটির ভঙ্গ ?
বনের বিহগ ওরা,
নগরের প্রাণচোরা
বায়ু নাহি ভালবাসে ; মুক্ত-বায়ু-সঙ্গ
পেয়ে যেন মাতোয়ারা বনের বিহঙ্গ !
কি জানি কেমন পাখী
সোনার পিঞ্জরে রাখি,
সুন্দর সামগ্রী দিনু ; হ্যাদে দেখ রঙ্গ !
কিছুতেই বাজিল না প্রাণের সারঙ্গ
(তাই) পিঞ্জর খুলিয়া দিনু,
শিকলি কাটিয়া দিনু,
বনেতে উড়িয়া গেল বনের বিহঙ্গ—
সুন্দরি, শ্রী অঙ্গে কেন ভ্রূকুটির ভঙ্গ ?

প্যারিস্ হইতে লণ্ডনে।

য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারী।

৮ সেপ্টেম্বর। পথের মধ্যে আমাদের প্যারিসে নাব্‌বার প্রস্তাব হচ্চে। কিন্তু আমাদের এই ট্রেন্ প্যারিসে যায় না— একটু পাশ কাটিয়ে যায়। প্যারিসের একটি নিকটবর্ত্তী ষ্টেশনে স্পেশল ট্রেন্ প্রস্তুত রাখবার জন্যে টেলিগ্রাফ্ করা গেল।

রাত দু'টোর সময় আমাদের জাগিয়ে দিলে। ট্রেন বদল রতে হবে। জিনিষপত্র বেঁধে বেরিয়ে পড়লুম। বিষম ণ্ডা। অনতিদূরে আমাদের গাড়ি দাঁড়িয়ে। কেবলমাত্র কটি এঞ্জিন্, একটি ফাষ্টক্লাস্ গাড়ি, এবং একটি ব্রেক্‌ভ্যান্। ারোহীর মধ্যে আমরা তিনটি ভারতবর্ষীয়। রাত তিনটের ময় প্যারিসের জনশূন্য বৃহৎ ষ্টেশনে পৌঁছন গেল। সুপ্তোত্থিত ই একজন "ম্যসিয়" আলো হস্তে উপস্থিত। অনেক হাঙ্গাম রে' নিদ্রিত কাষ্টম্ হৌস্‌কে জাগিয়ে তার পরীক্ষা থেকে ত্তীর্ণ হয়ে একটা গাড়ি ভাড়া করলুম। তখন প্যারিস্ তার মস্ত দ্বার রুদ্ধ করে' স্তব্ধ রাজপথে দীপশ্রেণী জ্বালিয়ে াথে নিদ্রামগ্ন। আমরা হোটেল ট্যার্মিনূতে আমাদের শয়ন- ক্ষে প্রবেশ করলুম। পরিপাটি, পরিচ্ছন্ন, বিদ্যুদুজ্জ্বল, স্ফটিক- ণ্ডিত, কার্পেটাবৃত, চিত্রিতভিত্তি, নীলযবনিকাপ্রচ্ছন্ন শয়ন- ালা; বিহগপক্ষ সুকোমল শুভ্র শয্যা।

বেশ পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক শয়নের উদ্যোগ করবার সময় দেখা গল আমাদের জিনিষপত্রের মধ্যে আর এক জনের ওভার্‌কোট্ াত্রবস্ত্র। আমরা তিনজনেই পরস্পরের জিনিষ চিনিনে; সুতরাং াতের কাছে যে কোন অপরিচিত বস্তু পাওয়া যায় সেইটেই

আমাদের কারো-না-কারো স্থির করে' অসংশয়ে সংগ্রহ করে' আনি। অবশেষে নিজের নিজের জিনিষ পৃথক্ করে' নেবার পর যখন দুটো চারটে উদ্বৃত্ত সামগ্রী পাওয়া যায়, তখন তা' আর পূর্ব্বাধিকারীকে ফিরিয়ে দেবার কোন সুযোগ থাকে না। ওভারকোট্‌টি রেলগাড়ি থেকে আনা হয়েচে; যার কোট্ সে বেচারা বিশ্বস্তচিত্তে গভীর নিদ্রায় মগ্ন। গাড়ি এতক্ষণে সমুদ্র-তীরস্থ ক্যালে নগরীর নিকটবর্ত্তী হয়েচে। লোকটি কে, এবং সমস্ত বৃটিশ রাজ্যের মধ্যে তার ঠিকানা কোথায়, আমরা কিছুই জানিনে। মাঝের থেকে তার লম্বা কুর্ত্তি এবং আমাদের পাে ভার স্কন্ধের উপর বহন করে বেড়াচ্চি—প্রায়শ্চিত্তের পথ ব মনে হচ্চে, এ কবার যে লোকটির কম্বল হরণ করেছিলুম কুর্ত্তিটিও তার। কারণ, রেলগাড়িতে সে ঠিক আমাদের পরব শয্যা অধিকার করেছিল। সে বেচারা বৃদ্ধ, শীতপীড়ি বাতে পঙ্গু, অ্যাংলো-ইণ্ডিয় পুলিস্ অধ্যক্ষ। পুলিসের ক করে' মানবচরিত্রের প্রতি সহজেই তার বিশ্বাস শিথিল হ এসেছে, তার পরে যখন দেখ্‌বে এক যাত্রায় একই রকম ঘট একই লোকের দ্বারা গভীর রাত্রে দুই দুইবার সংঘটন হ তখন আর যাই হোক্ কখনই আমাকে যে ব্যক্তি সুশীল ব ঠাওরাবে না। বিশেষতঃ কাল প্রত্যূষে ব্রিটিশ্ চ্যানেল্ প হবার সময় তীব্র শীতবায়ু যখন তার হৃতকুর্ত্তি জীর্ণ দেহ কম্পান্বিত করে' তুল্‌বে তখন সেই সঙ্গে মনুষ্যজাতির সাধুত প্রতিও তার বিশ্বাস চতুর্গুণ কম্পিত হতে থাকবে।

৯ সেপ্টেম্বর। প্রাতঃকালে দ্বিতীয়বার বেশ পরিবর্ত্তন ক বার সময় দেখা গেল আমার বন্ধুর একটি পোর্টম্যাণ্টো পাও যাচ্চে না। আমরা যে তিনটি লোক পৃথিবী পর্য্যটনে বেরিয়ে

তিনজনেই প্রায় সমান। আমার বোধ হচ্চে, মাসতিনেক পরে যখন জন্মভূমিতে ফির্‌ব তখন দেখ্‌তে পাব আমাদের নিজের আবশ্যকীয় যে ক'টি জিনিষ সঙ্গে এনেছিলুম তার একটিও নেই এবং পরের অনাবশ্যক স্তূপাকার জিনিষ কোথায় রাখ্‌ব স্থান পাচ্চিনে, মাশুল দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে টেনে নিয়ে বেড়াচ্চি এবং মাঝে মাঝে অসহ্য ব্যাকুল হয়ে ভিন্ন ভাষার সংবাদপত্রে বহুব্যয়ে বিজ্ঞাপন দিচ্চি।

যাহোক্ পুলিসে সংবাদ দিয়ে প্রাতঃকালে আমরা তিন জনে প্যারিসের পথে পদব্রজে বেরিয়ে পড়লুম। প্রকাণ্ড রাজপথ দোকান বাগান প্রাসাদ প্রস্তরমূর্ত্তি ফোয়ারা লোকজন গাড়ি-ঘোড়ার মধ্যে অনেক ঘুরে ঘুরে এক ভোজন-গৃহের বিরাট স্ফটিকশালার প্রান্তটেবিলে বসে' অল্প আহার করে' এবং বিস্তর মূল্য দিয়ে ঈফেল্ স্তম্ভ দেখ্‌তে গেলেম। এই লৌহস্তম্ভ চারি পায়ের উপরে ভর দিয়ে এক কাননের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে। কলের দোলায় চড়ে' এই স্তম্ভের চতুর্থ তলায় উঠে নিয়ে সমস্ত প্যারিসটাকে খুব একটা বড় ম্যাপের মত প্রসারিত দেখ্‌তে পেলুম।

বলা বাহুল্য, এমন করে' একদিনে তাড়াতাড়ি চক্ষু দ্বারা বহির্ভাগ লেহন করে' প্যারিসের রসাস্বাদন করা যায় না। এ যেন, গৃহের মেয়েদের মত বন্ধ পাল্কীর মধ্যে থেকে গঙ্গাস্নান করার মত—কেবল নিতান্ত তীরের কাছে একটা অংশে এক ডুবে যতখানি পাওয়া যায়। কেবল হাঁপানিই সার।

হোটেলে এসে দেখ্‌লুম পুলিসের সাহায্যে বন্ধুর পোর্টম্যাণ্টো ফিরে এসেছে, কিন্তু এখনো সেই পরের হৃতকোর্ত্তা সম্বন্ধে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে আছি।

১০ সেপ্টেম্বর। লণ্ডন অভিমুখে চল্লুম। সন্ধ্যার সময় লণ্ডনে

পৌঁছে দুই একটি হোটেল অন্বেষণ করে' দেখা গেল স্থানাভাব। অবশেষে একটি ভদ্র পরিবারের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করা গেল।

১১ সেপ্টেম্বর। সকালবেলায় আমাদের পুরাতন বন্ধুদের সন্ধানে বাহির হওয়া গেল।

প্রথমে, লণ্ডনের মধ্যে আমার সর্ব্বাপেক্ষা পরিচিত বাড়ির দ্বারে গিয়ে আঘাত করা গেল। যে দাসী এসে দরজা খুলে দিলে তাকে চিনিনে। তাকে জিজ্ঞাসা করলুম আমার বন্ধু বাড়িতে আছেন কি না। সে বল্লে তিনি এ বাড়িতে থাকেন না। জিজ্ঞাসা করলুম, কোথায় থাকেন? সে বল্লে, আমি জানিনে, আপনারা ঘরে এসে বসুন আমি জিজ্ঞাসা করে আসচি। পূর্ব্বে যে ঘরে আমরা আহার করতুম সেই ঘরে গিয়ে দেখলুম সমস্ত বদল হয়ে গেছে—সেখানে টেবিলের উপর খবরের কাগজ এবং বই—সে ঘর এখন অতিথিদের প্রতীক্ষাশালা হয়েছে। খানিকক্ষণবাদে দাসী একটি কার্ডে লেখা ঠিকানা এনে দিলে। আমার বন্ধু এখন লণ্ডনের বাইরে কোন্ এক অপরিচিত স্থানে থাকেন। ভারি নিরাশ হৃদয়ে আমার সেই পরিচিত বাড়ি থেকে বেরলুম।

মনে কল্পনা উদয় হল, মৃত্যুর বহুকাল পরে আমার যেন পৃথিবীতে ফিরে এসেচি। আমাদের সেই বাড়ির দরজার কাছে এসে দ্বারীকে জিজ্ঞাসা করলুম—আমার সেই অমুক এখানে আছে ত? দ্বারী উত্তর করলে—না—সে অনেক দিন হল চলে গেছে।—চলে গেছে? সেও চলে গেছে! আমি মনে করেছিলুম কেবল আমিই চলে গিয়েছিলুম, পৃথিবী-সুদ্ধ আর সবাই আছে। আমি চলে যাওয়ার পরেও সকলেই আপন আপন সময় অনুসারে চলে গেছে। তবে ত সেই সমস্ত জানা

লোকেরা আর কেহ কারো ঠিকানা খুঁজে পাবে না! জগতের কোথাও তাদের আর নির্দ্দিষ্ট মিলনের জায়গা রইল না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাব্‌চি এমন সময়ে বাড়ির কর্ত্তা বেরিয়ে এলেন—জিজ্ঞাসা করলেন তুমি কে হে! আমি নমস্কার করে' বল্লুম, আজ্ঞে, আমি কেউ না, আমি বিদেশী।—কেমন করে' প্রমাণ করব এ বাড়ি আমার এবং আমাদের ছিল! একবার ইচ্ছে হল, অন্তঃপুরের সেই বাগানটা দেখে আসি; আমার সেই গাছগুলো কত বড় হয়েছে! আর সেই ছাতের উপরকার দক্ষিণ-মুখো কুঠরি, আর সেই ঘর এবং সেই ঘর এবং সেই আর একটা ঘর। আর সেই যে ঘরের সম্মুখে বারান্দার উপর ভাঙ্গা টবে গোটাকতক জীর্ণ গাছ ছিল—সেগুলো এত অকিঞ্চিৎকর যে সেগুলো হয়ত ঠিক তেম্‌নি রয়ে গেছে তাদের সরিয়ে ফেল্‌তে কারো মনেও পড়েনি!

আর বেশিক্ষণ কল্পনা করবার সময় পেলুম না। আমাদের গাড়ি মিস্ শ-য়ের বাড়ির সম্মুখে এসে দাঁড়াল। গিয়ে দেখ্‌লুম তিনি নির্জ্জনগৃহে বসে' একটি পীড়িত কুক্কুরশাবকের সেবায় নিযুক্ত আছেন। জল বায়ু, পরস্পরের স্বাস্থ্য এবং কালের পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে কতকগুলি প্রচলিত শিষ্টালাপ করা গেল।

সেখান থেকে বেরিয়ে, লণ্ডনের সুড়ঙ্গপথে যে পাতাল-বাষ্পযান চলে, তাই অবলম্বন করে' বাসায় ফেরবার চেষ্টা করা গেল। কিন্তু পরিণামে দেখ্‌তে পেলুম পৃথিবীতে সকল চেষ্টা সফল হয় না। আমরা দুই ভাই ত গাড়িতে চড়ে' বেশ নিশ্চিন্ত বসে' আছি; এমন সময় গাড়ি যখন হ্যামার্‌স্মিথ্ নামক দূরবর্ত্তী ষ্টেশনে গিয়ে থাম্‌ল তখন আমাদের বিশ্বস্ত চিত্তে ঈষৎ সংশয়ের সঞ্চার হল। একজনকে জিজ্ঞাসা করাতে সে স্পষ্ট বুঝিয়ে

দিলে আমাদের গম্যস্থান যে দিকে এ গাড়ির গম্যস্থান সেদিকে নয়। পুনর্ব্বার তিন চার ষ্টেশন ফিরে গিয়ে গাড়ি বদল করা আবশ্যক। তাই করা গেল। অবশেষে গম্য ষ্টেশনে নেমে রাস্তায় বেরিয়ে আমাদের বাসা খুঁজে পাইনে। বিস্তর গবেষণার পর বেলা সাড়ে তিনটের সময় বাড়ি ফিরে ঠাণ্ডা টিফিন খাওয়া গেল। এইটুকু আত্মজ্ঞান জন্মেছে যে, আমরা ছুটি ভাই লিভিংষ্টোন অথবা ষ্ট্যান্লির মত ভৌগোলিক আবিষ্কারক নই; পৃথিবীতে যদি অক্ষয় খ্যাতি উপার্জ্জন করতে চাই ত নিশ্চয়ই অন্য কোন দিকে মনোনিবেশ করতে হবে।

সাধনা—প্রাচ্য ও প্রতীচ্য।

(চৈতন্য লাইব্রেরির ষড়বিংশ অধিবেশনে প্রপঠিত।)

মহরমের সময় সিয়া সম্প্রদায়ের মুসলমানেরা যেমন রাস্তার মাঝখানে হাসেন্ হোসেন্ করিয়া বক্ষে করাঘাত করে, ঠিক্ সেইরূপ একটা ক্রন্দন এবং বিলাপের অভিনয় সম্প্রতি আমাদের দেশের একদল নিষ্কর্ম্মা লোকের একটা বাতিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কাঁছুনি-গায়কদিগের ধুয়া এই যে, আমাদের দেশের ধর্ম্ম যে একটি সেকেলে পৈতৃক সম্পত্তি—বৈরাগ্য, একেলে সভ্যতার হস্তে পড়িয়া তাহার অন্তিমদশা ঘুনাইয়া আসিয়াছে—তিনি আর বেশী দিন টেকেন না! এইরূপ ক্রন্দন শুনিলে আমাদের হাসিও পায়, কান্নাও পায়। হাসি পায় তার কারণ এই যে, বৈরাগ্য যদি এতই তোমার প্রিয় বস্তু, তবে তাহার পথ অবলম্বন কর——ক্রন্দন কেন? একেলে সভ্যতা তো আর তোমার হাত পা বাঁধিয়া রাখে নাই; কোতোয়ালের প্রতি মহারাণীর এমন তো

কোনো শক্ত রাজাজ্ঞা নাই যে, "কাহাকেও বৈরাগ্যের পথে চলিতে দেখিয়াছ কি আর অমনি তাহার শির লইবে!" বৈরাগ্য তো আর বাজারের সামগ্রী নয় যে, সেকালের বাজারে তাহা সুলভ ছিল, একালের বাজারে তাহা দুর্ম্মূল্য হইয়াছে! বাজারের সামগ্রী স্বতন্ত্র, আর, অন্তঃকরণের সামগ্রী স্বতন্ত্র; বাজারের সামগ্রী ক্রয়-বিক্রয়ের বস্তু—অন্তঃকরণের সামগ্রী সাধনের বস্তু। তুমি বলিবে যে, কাল পড়িয়াছে শক্ত; চব্বিস ঘণ্টা সংসার-কার্য্যে চব্বিস আনা লিপ্ত থাকিলে, যদি এক আনা কাজ হাসিল হয় তবে তাহাই গৃহী ব্যক্তির পরম সৌভাগ্য; দেখিতেছ না—একটা কেরাণিগিরি খালি হইয়াছে কি আর অমনি দলকে-দল বি-এ এম্-এ কাতারে কাতারে পিঁপড়ার পালের ন্যায় আপিস অঞ্চলে গতায়াত করিতে থাকে! ইহার উত্তরে আমি এই বলি যে, প্রকৃত বৈরাগ্য সংসারের কোনো কর্ত্তব্য সাধনেরই প্রতিবন্ধকতাচরণ করে না—তাহা দূরে থাকুক্, সেরূপ বৈরাগ্য কর্ত্তব্য সাধনের পথ আরো পরিষ্কার করিয়া দেয়। বৈরাগ্য-অভ্যাস আর কিছু না—মনের সুর বাঁধা; সেতারের সুর বাঁধা থাকিলে তাহাতে, যে রাগিণী ইচ্ছা, সেই রাগিণীই বাজানো যাইতে পারে; তেমনি অন্তঃকরণে বৈরাগ্যের সুর বাঁধা থাকিলে—যখন যাহা কর্ত্তব্য তাহাই সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করা যাইতে পারে। মন রাগ-দ্বেষে অধীর থাকিলে হাতের কাজ কখনই ভাল হইতে পারে না; বৈরাগ্যের অভ্যুদয়ে মন প্রশান্ত হইলে কর্ত্তব্য কার্য্যে হাত পা আপনা হইতেই অগ্রসর হয়। আমরা পরে দেখাইব যে, প্রকৃত বৈরাগ্য নিষ্কাম কর্ম্মের মূল প্রবর্ত্তক; আর, যে বৈরাগ্য কর্ত্তব্য-সাধনের প্রতিবন্ধকতাচরণ করে, সে বৈরাগ্য বৈরাগ্যই নহে—তাহা বৈরাগ্যের ভান মাত্র। তবে যদি তোমার ক্রন্দনের

কারণ এই হয়—যে, সেকালে যেমন পথে ঘাটে হাটে বৈরাগ্যের ছড়াছড়ি ছিল, একালে তাহার চিহ্নপর্য্যন্তও লোপ পাইবার উপক্রম হইয়াছে—যদি বল যে, ব্রাহ্মণের মাথায় টিকি নাই, জিহ্বাগ্রে সন্ধ্যার বুলি মুখস্থ নাই—বৈষ্ণবের নাশায় তিলক নাই, গলায় মালা নাই—শাক্তের ললাটে রক্তচন্দনের ফোঁটা নাই—এ অপেক্ষা বৈরাগ্যের অভাব আর কি হইতে পারে? তবে সেটা একটা কাঁদিবার কথা বটে! বলিতে কি—সেকাল-ভক্তের এইরূপ হৃদয়ভেদী ক্রন্দন শুনিলে আমাদেরও কান্না পায়; আমরা কাঁদি আর এক কারণে! সে কারণ এই যে, ইউরোপের তামসিক মধ্যম অব্দে তৎপ্রদেশে friar, monk, hermit প্রভৃতি কত সম্প্রদায়ের কত যে সন্ন্যাসী তপস্বী এবং বৈরাগী কত যে অদ্ভুত লীলা প্রদর্শন করিয়া রাজ্যের লোকদিগকে চমকিত করিতেন, তাহার আর 'বলতব্য কহতব্য' নাই; ইংলণ্ডীয় স্যাক্সন আমলের ডন্‌ষ্টন্‌ মুনি আমাদের দেশের পৌরাণিক আমলের দুর্ব্বাসা মুনি অপেক্ষা পরাক্রমে বেশী বই কম ছিলেন না! ইংরাজেরা মনে করিলে সেই সকল অদ্ভুত যোগী তপস্বীদিগের অদ্ভুত পরাক্রম স্মরণ করিয়া "হায় সেকাল হায় সেকাল" বলিয়া অশ্রুজলে টেম্‌স্‌ নদীকে পদ্মা-নদী করিয়া তুলিতে পারেন, কিন্তু তাঁহারা তাহা করেন না—তাঁহাদের দেশের সেই সকল পুরাতন কীর্ত্তি স্মরণ করিয়া তাঁহাদের চক্ষে এক ফোঁটা জলেরও সঞ্চার হয় না, অধরে ঈষৎ হাস্যেরই উদ্রেক হয়! ইউরোপের চক্ষু জল-প্রিয় নহে—তাহা আলোক-প্রিয়! ইউরোপ অজ্ঞান-নিদ্রা হইতে জাগিয়া উঠিয়া বার দুই হাই তুলিয়া বেগে গা-ঝাড়া দিতেই সেকালের সেইসব উৎপেতে জঞ্জাল-গুলা কোথায় যে কোনদিকে সট্‌কিয়া পড়িল—আর তাহার চিহ্নমাত্রও দেখিতে পাওয়া গেল না। কিন্তু হায়! আমাদের এই

হতভাগ্য দেশের নিদ্রা ভাঙিয়াও ভাঙিতেছে না! আমাদের দেশের চক্ষে বিজ্ঞানের আলোক পতিত হইয়া একবার যেই তাহাকে সচকিত করিয়া তুলিতেছে—পরক্ষণেই আমাদের দেশ যেমন-কে-তেমনি শয্যায় অচেতন। কথাটি আর কিছু না—যেখানেই অন্ধ-ভক্তি অতিমাত্র প্রবল এবং জ্ঞানালোক অতিমাত্র ক্ষীণ, সেই-খানেই পেঁচা বাদুড় সাপ ব্যাঙ প্রভৃতি তামসিক জন্তুদিগের পরা-ক্রম দিন দিন বাড়িয়া উঠিতে থাকে। সার ওয়াল্টর স্কটের আইভান্‌হো উপন্যাসের Friar Tuck একজন পেচক শ্রেণীর বৈরাগী ছিলেন—দিবালোকে তিনি কোটরের বাহিরে পদার্পণ করিতেন না। আমাদের দেশে পানিহাটি গ্রামে আজিও গঙ্গা-তীরে বটচ্ছায়া-পরিবৃত অতীব একটি রমণীয় কোটর দেখিতে পাওয়া যায়—পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহে তাহা কাঙ্গালদাস বাবাজির আখ্‌ড়া বলিয়া সুপ্রসিদ্ধ; গ্রাম-বৃদ্ধদিগের মুখে কাঙ্গালদাস বাবাজির কীর্ত্তি-কাহিনী যেরূপ শুনিতে পাওয়া যায়, তাহাতে তিনি যে, পেচক শ্রেণীর বৈরাগীদিগের একজন প্রধান নায়ক ছিলেন, সে বিষয়ে আর কাহারো সন্দেহ থাকিতে পারে না। এই গেল পেচক তপস্বী; বাদুড় তপস্বী কি? না মাথা নিচু পা উঁচু করিয়া গাছে-ঝোলা যোগী তপস্বী। সাপ-ব্যাঙ তপস্বী [illegible] না মাটির নীচে কবর দেওয়া সিদ্ধপুরুষ। এখনকার [illegible]র এই সকল অদ্ভুত যোগী তপস্বীদিগের অনটন দেখিয়া [illegible]গুলের কথকেরা কত না ললাটে করাঘাত করেন, কত [illegible]হুতাশ করিয়া ক্রন্দন করেন! ইহাঁদের এই ক্রন্দন [illegible]হলের মাঝখানে কে যেন আমাদের কর্ণকুহরে ধীরে [illegible] বলিতেছে যে, যেখানে দেখিবে—চিড়িয়াখানার যোগী [illegible]ীদিগের অদ্ভুত পরাক্রম দেখিয়া বিজ্ঞান শিল্প এবং বাণিজ্য

ব্যবসায়ের প্রতি লোকের ধিক্কার জন্মিতেছে সেইখানেই জানিবে জ্ঞানের দিবাকর অস্তমিত এবং অবিদ্যার ঘোরা তামসী বিভাবরী সমাগত।

পেঁচা বাদুড়, সাপ ব্যাঙ প্রভৃতি জন্তু-তপস্বীদিগকে আড়ালে সরাইয়া রাখিয়া প্রকৃত মানুষ-তপস্বী কিরূপ তাহার প্রতি একবার চক্ষুরুন্মীলন কর;—আফ্রিকা দেশের অন্তর্বিভাগের আবিষ্কর্ত্তাদিগের যাহার কাহারো অদ্ভুত কীর্ত্তি-কাহিনী পাঠ কর—দেখিতে পাইবে যে, মনুষ্য ভোগ-স্পৃহাকে কতদূর পশ্চাতে রাখিয়া, সম্মুখের বিভীষিকাকে কতদূর তুচ্ছ করিয়া, সংকল্প সাধনের পথে কতদূর অগ্রসর হইতে পারে। ইহাঁদের এক একজনের এক এক কার্য্য দেখিলে মনে হয় যে, মনুষ্যের অ[illegible]াধ্য কার্য্যই নাই, মনুষ্যের অগম্য স্থানই নাই। ইহাঁদের তপঃসাধনের প্রণালীই স্বতন্ত্র! সম্মুখে বিপদ্ বলিয়া বিপদ নহে—বিপদের পর্ব্বত-পরম্পরা উপর্য্যুপরি মাথা তুলিয়া পথ আগলিয়া দাঁড়াইয়া আছে; সমস্ত প্রদেশই অজ্ঞাত অপরিচিত; সকলই প্রহেলিকা—সকলই গোলোক-ধাঁধা; উপস্থিত মতে বুদ্ধি খাটাইয়া এক এক পদ অগ্রসর হওয়া হইতেছে, আর, চারিদিকের কোথায় কি আছে না আছে তাহার সন্ধান লওয়া হইতেছে; সঙ্গে লোক একে তো পঞ্চাশের অধিক নহে, তাহাতে আবার তাহারা সক[illegible] কাফ্রী; ব্যথার ব্যথী কেবল একজন মাত্র স্বদেশীয় ভ্রাতা—[illegible] পীড়ায় মরণাপন্ন; তাঁহার সেবার ত্রুটি না হয় এটা খুব [illegible] তার সহিত ঘড়ি ঘড়ি দেখিতে হইতেছে; মরুভূমির মধ্যে তিন দিন জলাভাবে এবং দুর্ভিক্ষ-পীড়িত প্রদেশের তিন চারিদিন অন্নাভাবে প্রাণ ওষ্ঠাগত; মাথার উপরে [illegible] দিবাকর এবং বায়ু যেন কালের নিশ্বাসাগ্নি! তাহাতে আ[illegible]

ঘটনাক্রমে বোল্‌তার চাকে ঘা দেওয়া হইয়াছে—একজন দেশীয় রাজাকে নজর দিয়া তুষ্ট করা হয় নাই; সেই গুরুতর অপ-রাধের শাস্তি দিবার জন্য চারিদিকে সহস্রাধিক শক্র ঘাটি মারিয়া শিকার প্রতীক্ষা করিতেছে। এই সকল ভয়ঙ্কর বিঘ্ন বিপত্তির মধ্য-স্থলে আবিষ্কর্ত্তা এক দিনের জন্যও ভগ্নোদ্যম হ'ন নাই; ক্ষণকালের জন্যও তিনি মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়েন নাই—বিছানায় শুইয়া পড়েন নাই; ক্রমাগতই তিনি সাহসে ভর করিয়া স্থিরভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। যখন যাহা আবশ্যক তাহারই জন্য তিনি প্রস্তুত! সুবিশাল মরুভূমি পার হইতে হইবে তাহারই জন্য প্রস্তুত! দুস্তর নদীতে নৌ-সেতু বাঁধিয়া ওপারে যাইবার পথ খুলিতে হইবে, তাহা-রই জন্য প্রস্তুত! প্রাণ হস্তে করিয়া শক্রদলের মধ্য দিয়া যাত্রা করিতে হইবে, তাহারই জন্য প্রস্তুত! ইহা কি তপস্যা নহে! পৃথিবীর মেরুপ্রান্তের আবিশ্চিকীর্ষু মহাত্মারা আরো ভয়ঙ্কর অধ্যবসায়ী। এক দিন নয়—দুই দিন নয়—ছয় ছয় মাস ধরিয়া, কখনো বা বৎসরেক ধরিয়া, প্রতিমুহূর্ত্ত তাঁহারা শব-সাধনের বিভীষিকায় পরিবেষ্টিত! এক এক মুহূর্ত্ত এক এক বৎসর! কখন্ কোথা হইতে এবং কতদিক্ হইতে বরফের চাপ আসিয়া তাঁহাদিগকে পিশিয়া ফেলিবে, তাহার কিছুই ঠিকানা নাই; কিয়ৎপরেই প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বরফের চাপ চৌদিক্ ঘিরিয়া জাহাজকে আটক করিয়া ফেলিয়াছে—আর জাহাজ-শুদ্ধ সমস্ত লোক কুঠার হস্তে করিয়া কেবলি বরফ কাটিতেছে—কেবলি বরফ কাটিতেছে! বরফ কাটিয়া বরফ কাটিয়া সম্মুখের পথ পরিষ্কার করিতেছে; পশ্চাতের পথ নহে—সম্মুখের পথ! এইরূপে দিন যাইতেছে রাত্রি যাইতেছে, শুক্ল-

পক্ষ যাইতেছে কৃষ্ণপক্ষ যাইতেছে—চক্ষে নিদ্রা নাই—হস্তপদে বিরাম নাই; শীত এমনি যে, তাহার প্রবল পরাক্রমে কাহারো কাহারো অঙ্গুলি খসিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে! এ কি তপস্যা নহে! তপস্যা শুধু কি মাথা নিচু পা উঁচু করিয়া গাছে ঝোলা আর পাতা ভক্ষণ করা! আফ্রিকার অন্তর্ভাগের জর্ম্মান আবিষ্কর্ত্তা যাঁহার কথা আমি একটু পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি—তিনি তাঁহার দৈনিক পুস্তকে এক স্থানে এটাও লিখিয়াছেন যে, "এত শত বিঘ্ন বিপত্তির মাঝখানে আমি ভগ্নোদ্যম হইতেছি না কেবল এই ভরসায় যে, সিদ্ধিদাতা বিধাতা কর্ত্তৃক আমি এ কার্য্যে নিয়োজিত হইয়াছি—এ কার্য্যে আমার জয়-লাভ হইবেই হইবে।" সমস্ত পথে ঈশ্বরের হস্ত ইঁহার নেতা—ঈশ্বরের মুখ-জ্যোতি ইঁহার ধ্রুবতারা—ইনি কি তপস্বী নহেন!

এই সকল মানুষ-তপস্বীদিগের অনুরাগ রাখিবার স্থান সর্ব্বোপরি ঈশ্বর এবং তাহার নীচেই স্বদেশ। ইহাঁরা স্বদেশের মুখ চাহিয়া ভীষণ তরঙ্গ-সংকুল দুস্তর মহাসাগর ভেলায় পার হ'ন; দুরারোহ পর্ব্বত-শিখরে মনুষ্যের কীর্ত্তিস্তম্ভ প্রতিষ্ঠা করেন; দেশের নামের দিগ্বিজয়ী মন্ত্রে ইহাঁদের দুই বাহু সহস্র বাহু হইয়া উঠে; দেশের নামে ইহাঁদের আক্রমণ-বেগ বিদ্যুৎকে হাসিয়া উড়াইয়া দেয় এবং সেই নামের সিংহনাদে ইহাঁদের প্রচণ্ড প্রতাপ উদ্যত বজ্রকে ভস্ম করিয়া ফেলে!

প্রতীচ্য প্রদেশে ঈশ্বরানুরাগের এক ধাপ নীচেই স্বদেশানুরাগ পূজ্য; তার সাক্ষী—মহাকবি শেক্সপীয়র তাঁহার অষ্টম হেনরি নাম নাটকে কার্ডিনাল উল্‌সীকে দিয়া বলাইয়াছেন—"Be just and fear not. Let all the ends thou aimest

at be thy country's, thy God's and truth's; ন্যায় পথে থাক, ভয় করিও না; তোমার সংকল্পিত সকল কার্য্যেরই যেন চরম লক্ষ্য হয় তোমার স্বদেশ তোমার ঈশ্বর এবং সত্য। কার্ডিনাল উল্‌সী যদি আমাদের দেশে জন্ম-গ্রহণ করিতেন তবে খুব সম্ভব যে, ঐ জায়গাটিতে তাঁহার মুখে দেশ-শব্দের পরিবর্ত্তে ধর্ম্ম-শব্দ বাহির হইত; তিনি নিশ্চয়ই বলিতেন যে, তোমার সংকল্পিত সকল কার্য্যেরই যেন চরম লক্ষ্য হয়—তোমার ধর্ম্ম, তোমার ভগবান্ এবং সত্য। কিন্তু ধর্ম্ম-শব্দের অর্থ এখানে সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম তত নয় যত জাতীয় ধর্ম্ম অথবা যাহা একই কথা কুলধর্ম্ম; যেমন ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম সন্ধ্যাবন্দনাদি, ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম যুদ্ধবিগ্রহ, বৈশ্যের ধর্ম্ম কৃষি-বাণিজ্য। জাতি-ভেদ, সম্প্রদায়-ভেদ, গৃহভেদ, এইরূপ ভেদ-বাহুল্য আমাদের দেশের এমনি একটা অস্থিমজ্জাগত রোগ যে, সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মও আমাদের দেশে বিশেষ বিশেষ সম্প্রদায়ের গণ্ডির মধ্যে প্রবেশ করিয়া বিশেষ বিশেষ আকার ধারণ করিয়া বসিয়া আছে; তাহা এইরূপ যে, দেখিলে হঠাৎ মনে হয়, যেন তাহা বিশেষ কোনো একটি সম্প্রদায়ের একচেটিয়া সম্পত্তি। যেমন, শমদমাদি-সাধন মুমুক্ষু ব্রহ্মজ্ঞানীর ধর্ম্ম; যমনিয়মাদি সাধন যোগীর ধর্ম্ম; যেন এ দুই প্রকার সাধনাঙ্গের কোনোটিই সাধারণতঃ সকল ব্যক্তির ধর্ম্ম নহে! কিন্তু বাস্তবিক দেখিতে গেলে—কি শমদমাদি সাধন, কি যম-নিয়মাদি সাধন, দুইই, বস্তুতা—তা এক বই দুই নহে;—কি? না সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম; অর্থাৎ সাধারণতঃ সকল মনুষ্যেরই অনুষ্ঠেয় ধর্ম্ম। এরূপ যখন—তখন তাহা সর্ব্বসাধারণের সাধনের সামগ্রী হওয়া উচিত; তাহা না হইয়া, মনুষ্য মাত্রেরই অনুষ্ঠেয় সেই সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম আমা-

দের দেশে যোগী তপস্বীদিগের সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম হইয়া দাঁড়াইয়াছে; তা বই, জন-সাধারণের ধর্ম্ম শুদ্ধ কেবল বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মে পর্য্যবসিত হইয়াছে; যেমন, ব্রাহ্মণ জাতির ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম, ক্ষত্রিয়জাতির ক্ষাত্র ধর্ম্ম, বৈশ্যজাতির বাণিজ্য ধর্ম্ম, শূদ্রজাতির দাস্য ধর্ম্ম ইত্যাদি। আমাদের দেশে জাতি এবং ধর্ম্ম দুয়ের মধ্যে প্রভেদ এত অল্প যে, জাতি রক্ষার নামই ধর্ম্মরক্ষা এবং ধর্ম্মরক্ষার নামই জাতি-রক্ষা। ইহার কারণ আর কিছু না—ইউরোপাদি প্রতীচ্য ভূমি-খণ্ডে মনুষ্যের প্রধান একটি গৌরব স্থল যেমন—স্বদেশ, আমাদের দেশে তেমনি—স্বজাতি। ইংরাজের মুখে "আমি ইংরাজ" এটা যেমন একটা জোরালো কথা, ক্ষত্রিয়ের মুখে "আমি ক্ষত্রিয়সন্তান" এটাও তেমনি একটা জোরালো কথা বটে—কিন্তু আর এক হিসাবে। "আমি ইংরাজ" এটা দেশীয় গৌরবের উচ্ছ্বাসবাণী; "আমি ক্ষত্রিয়-সন্তান" এটা জাতীয় গৌরবের অথবা বংশগৌরবের উচ্ছ্বাস-বাণী। ইউরোপীয়েরা যেমন দেশ রক্ষার্থে প্রাণ দিতে প্রস্তুত, আমাদের দেশের লোকেরা তেমনি জাতি-রক্ষার্থে প্রাণ দিতে প্রস্তুত; তাহার সাক্ষী—এক শতাব্দী পূর্ব্বে আমেরিকার রাজ-বিদ্রোহ দেশ-রক্ষার সংকল্প হইতে জন্ম-গ্রহণ করিয়াছিল—সিকি শতাব্দী পূর্ব্বে সিপাহী বিদ্রোহ জাতি-রক্ষার সংকল্প হইতে, টোটা-কাটার বিভীষিকা হইতে, জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। আজ বলিয়া নয়—মান্ধাতার আমল হইতে চিরকালই আমাদের দেশে দেশীয় মর্য্যাদা জাতীয় মর্য্যাদার নিকটে নতশির। আমাদের দেশে স্বজাতি বিজাতির মধ্যে যেমন কড়াক্কড় প্রভেদের সীমা নির্দ্ধারিত রহিয়াছে—স্বদেশ বিদেশের মধ্যে তাহার সিকির সিকিও নাই;—এখনও নাই, পূর্ব্বেও ছিল না। আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষেরা মনকে এই বলিয়া

প্রবোধ দিতেন যে, ভারতবর্ষ ছাড়া আর কোনো দেশ দেশই নহে; তাহার সাক্ষী—কালিদাস হিমালয়ের বর্ণনাস্থলে বলিয়াছেন "পূর্ব্বাপরৌ তোয়নিধী বগাহ্য স্থিতঃ পৃথিব্যাইব মানদণ্ডঃ" হিমালয় পূর্ব্ব সমুদ্র হইতে পশ্চিম সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া যেন পৃথিবী মাপিতেছে—অর্থাৎ এমুড়া হইতে ওমুড়া পর্য্যন্ত পৃথিবী জুড়িয়া অবস্থিতি করিতেছে। তাঁহারা যে, আর কোনো দেশের অস্তিত্ব অবগত ছিলেন না—এরূপ কথা আমি বলিতেছি না; আমি কেবল বলিতেছি যে, তাঁহাদের মনের ভাব এইরূপ ছিল—যেন ভারতবর্ষই সমগ্র পৃথিবী—আর কোন দেশ দেশই নহে। আর আর দেশকে তাঁহারা যদি বিদেশ বলিয়াও গণ্য করিতেন তাহা হইলে সেই বিদেশের প্রতিযোগে ভারতবর্ষ তাঁহাদের স্বদেশ পদবীতে উত্থান করিত। কিন্তু তাহা না করিয়া তাঁহারা আর আর দেশকে একেবারেই ন-স্যাৎ করিয়া উড়াইয়া দেওয়াতে ভারতবর্ষ তাঁহাদের নিকটে সমগ্র পৃথিবী হইয়া দাঁড়াইল—স্বদেশ আর হইতে পারিল না। এই কারণ গতিকে—ভারতবর্ষীয় সমস্ত খণ্ড জড়াইয়া একটি ব্যাপক স্বদেশীয় ভাব, আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের মনে জন্মিবারই অবকাশ পাইল না।

প্রতীচ্য ভূখণ্ডে স্বদেশের গাত্রে অপমানের একটু আঁচ লাগিলে দেশের এমুড়া হইতে ওমুড়া পর্য্যন্ত সমস্ত নগর গ্রাম পল্লী অগ্নি উজ্জ্বলন করিয়া গর্জ্জন করিতে থাকে; ভারতবর্ষে বাঙ্গালির দুর্দ্দশা দেখিয়া খোট্টা হাসে—খোট্টার দুর্দ্দশা দেখিয়া বাঙ্গালি হাসে; হিন্দুর দুর্দ্দশা দেখিয়া মুসলমান হাসে, মুসলমানের দুর্দ্দশা দেখিয়া হিন্দু হাসে; সমস্ত ভারতবর্ষের দুর্দ্দশা দেখিয়া 'হুতোম পেঁচা' হাসে আর বলে—"ঘুঁটে পোড়ে গোবর হাসে বলিহারি ঐক্যতা"। এই গেল মনের ঐক্য; তা বই আমা-

দের দেশে যত কিছু দলাদলির তর্জ্জন গর্জ্জন সমস্তই জাতি কুল লইয়া; দেশের সঙ্গে যাহার মূলেই কোনো সম্পর্ক নাই!

ইউরোপ দেশীয় মর্য্যাদার উপরে ভর করিয়া দাঁড়াইয়া বর্ত্তমান হইতে ভবিষ্যতে দৃষ্টি প্রেরণ করিতেছে; আমাদের দেশ জাতীয় মর্য্যাদার উপরে ভর করিয়া দাঁড়াইয়া বর্ত্তমান হইতে অতীতে দৃষ্টি প্রেরণ করিতেছে। দুয়ের মধ্যে কেবল যদি ভাবের মাত্র প্রভেদ হইত তাহা হইলে কোনো চিন্তা ছিল না; একজন নয় ভবিষ্যৎ লক্ষ্য করিতেছেন—আর এক জন নয় অতীত লক্ষ্য করিতেছেন, তাহাতে কি? বর্ত্তমান হইতে অতীতও যতদূর ভবিষ্যৎও ততদূর! চিন্তার বিষয় এখানে এই যে, দুয়ের মধ্যে শুধু ভাবের প্রভেদ নয়—কিন্তু কাজের প্রভেদ। দেশীয় ভাবের উদ্দীপনে যেমন কাজ হয়—জাতীয় ভাবের উদ্দীপনে তাহার সিকির সিকিও হয় না, উল্টা বরং কাজের ক্ষতি হয়; কেন না, স্বাধীন দেশে দেশের উন্নতি-সাধনে দেশীয় সকল ব্যক্তিরই সমান অধিকার; পক্ষান্তরে, কৃত্রিম ধর্ম্মবন্ধনে হাত-পা বাঁধা জাতির উন্নতি-সাধনে জাতীয় ব্যক্তিদিগের কাহারো কোনো হস্ত নাই; পূর্ব্বপুরুষেরা যাহা করিয়া আসিয়াছেন, জাতির নিকটে তাহাই কর্ত্তব্য, পূর্ব্বপুরুষেরা যাহা বলিয়া আসিয়াছেন জাতির নিকটে তাহাই বেদবাক্য। জাতির জাতিত্ব অতীতের উপরে দৃঢ় রূপে প্রতিষ্ঠিত—এবং তাহার সম্মুখে ভবিষ্যতের দ্বার একেবারেই অবরুদ্ধ।

ভূতকালের স্মরণ এবং ভবিষ্যতের উন্নতি, এ দুয়ের মধ্য-স্থলে বর্ত্তমানের সাধনা। পর্ব্বত হইতে যেমন নদী উপত্যকায় নামিয়া আসে, ভূতকালের স্মরণ তেমনি আপনা আপনি বর্ত্তমানে নামিয়া আসে;—আর আপনা আপনি যাহা নামিয়া আসে তাহাই

কাজের; তা ছাড়া অতীতের আর যাহা কিছু—সমস্তই অন্ধ-কেরে উপন্যাস-জল্পনা। ভবিষ্যতের উন্নতি কিন্তু কোথা হইতেও নামিয়া আসে না; তাহা সাধনাকে অপেক্ষা করে, পুরুষের কর্তৃত্বকে অপেক্ষা করে। ইংলণ্ডে কেহই Magna chartaর নামও করে না—কি জন্য করিবে? Magna charta ইংলণ্ডে মৃত স্মরণের বস্তু নয়—তাহা জীবন্ত সাধনের বস্তু! Magna charta ইংলণ্ডের পথে ঘাটে মাঠে হাটে জলদক্ষরে মুদ্রাঙ্কিত রহিয়াছে—জনপদের প্রতি নিশ্বাস প্রশ্বাসে চলা ফেরা করিতেছে; ইংলণ্ডের চক্ষে তাহা প্রত্যক্ষ দেদীপ্যমান! যাহা প্রত্যক্ষ দেদীপ্যমান তাহার জন্য স্মরণের চাবি হাতে করিয়া চোরের ন্যায় ভূতকালের অন্ধিসন্ধি হাতড়াইয়া বেড়াইবার কোনো প্রয়োজন করে না। আমাদের দেশের অতীত-কালের স্মরণীয় উপন্যাস যত কিছু সমস্তই অন্তঃপুরের স্ত্রীলোক-পরম্পরায় নির্ব্বিঘ্নে চলিয়া আসিতেছে—পুরুষদিগকে তাহার জন্য ভাবিতে হইবে না; বর্ত্তমানের সাধনাই পুরুষ-জাতিকে শোভা পায়। বর্ত্তমানের কাজের কথা ছাড়িয়া ভূতকালের উপন্যাস-জল্পনা অতিবৃদ্ধা পিতামহীর মুখেই—অতি সুকুমার কচি বালকের কর্ণেই—শুনায় ভাল। ইউরোপীয়দিগের ভরসা living present, জীবন্ত একাল! আমাদের ভরসা dead past, মৃত সেকাল; দুয়ের মধ্যে কি বিশাল ব্যবধান!

বলিলাম "মৃত সেকাল"—কিন্তু এ কথাটির একটু টীকা করা আবশ্যক। সে কালেরই হউক আর একালেরই হউক যাহা ভাল জিনিস্ তাহা মরে না—মরিতে কেবল বাজে জিনিস্ই মরে, কালতো জিনিস্ই মরে। মরিতে কেবল শরীরই মরে—আত্মা মরে না।

বেদের শরীর অনেককাল যাবৎ মরিয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহার আত্মা আজিও সজীব রহিয়াছে;—যাগযজ্ঞের মন্ত্রতন্ত্র মরিয়া ভূত হইয়া গিয়াছে—কিন্তু উপনিষদের ধর্ম্ম নব-জীবন হইতে নবতর জীবনে দিন দিন সমুত্থান করিতেছে। ইংলণ্ডের বৈরতন্ত্র (Feudal system) অনেককাল মরিয়া গিয়াছে কিন্তু তাহার Magna charta আজিও জাগ্রত জীবন্ত। পুরাণ তন্ত্রাদিকেই আমরা সেকালের সামগ্রী বলিতে পারি; পুরাণ শব্দের অর্থই হ'চ্চে পুরাতন অথবা যাহা একই কথা সেকেলে; কিন্তু উপনিষদ্ ভগবদ্গীতা প্রভৃতি উচ্চ অঙ্গের শাস্ত্র-গুলিকে আমরা সেকেলে বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারি না;—এ-গুলির উৎপত্তি সেকালে হইলেও এগুলি সেকেলে নহে—এগুলি সব-কেলে; এগুলি পুরাতন নহে—এগুলি সনাতন। সেকেলে হিন্দু-ধর্ম্ম কি? না—বৈদিক যাগযজ্ঞাদি, পৌরাণিক অবতার পূজাদি, তান্ত্রিক প্রতিমা পূজাদি; সনাতন হিন্দুধর্ম্ম কি? না—উপনিষদের ব্রহ্মজ্ঞান; ভগবদ্গীতার ভগবদ্ভক্তি এবং নিষ্কাম কর্ম্ম; এবং ঐরূপ আর আর উচ্চাশয় শাস্ত্রের যে-সকল মহাবাক্য সর্ব্বকালেই এবং সর্ব্বদেশেই লোকের পূজা আকর্ষণ করে, সেই সকল অমূল্য রত্ন। কিন্তু শাস্ত্রের অগাধ সমুদ্র হইতে সেই সকল মহাবাক্য উদ্ধার করিতে পারে—এমন ডুবুরী আমাদের দেশে কয় জন? ডুবুরী যদিবা রত্ন উদ্ধার করিল—তাহা চিনিতে পারে এমন জহরীই বা আমাদের দেশে কয় জন?*

---

* আমাদের দেশের জনসাধারণ যে কিরূপ জহুরী, কিরূপ সমজ্দার, তাহার পরিচয় আমি অনেকবার অনেক রকমে পাইয়াছি। তাহার একটি উদাহরণ দিতেছি; ব্রাহ্মসমাজের কোনো উৎসব উপলক্ষে বোম্বাই প্রদেশের একটা দেশীয় রাগিণীর একটি গীত ভাঙিয়া একটি ব্রহ্মসঙ্গীত প্রস্তুত করিয়া তাহা

আমাদের দেশ একটা প্রকাণ্ড রথ; তার সারথী হ'চ্চে সেকেলে শাস্ত্র, আর অশ্ব হ'চ্চে লোকাচার। সারথীটি বার্দ্ধক্যের বশতাধীনে এমনি অথর্ব্ব হইয়া পড়িয়াছেন যে, তিনি

সভাস্থলে গান করা হইয়াছিল; তাহা শুনিয়া শ্রোতৃবর্গের প্রায় সকলেরই এইরূপ ধারণা হইল যে, সে গীতের স্থর নিশ্চয়ই ইংরাজি স্থর। বাঙ্গালা এবং হিন্দুস্থানী গীত যাহা আমাদের দেশের কাণে চিরাভ্যস্ত—এ দেশীয় লোকের ধ্রুব সংস্কার যে. তাহাই বিশুদ্ধ প্রাচীন ভারতবর্ষীয় সামগ্রী; তাহার একটু এদিক্ ওদিক্ হইলে—আমাদের দেশের লোক তাহাকে একেবারেই বিলাতের আমদানি বলিয়া স্থিরস্থার করিয়া বসিয়া থাকেন! বিংশতি বৎসর পূর্ব্বে এ দেশের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা, পশ্চিম প্রদেশীয় পণ্ডিতদিগের সংস্কৃত উচ্চারণ শুনিলে হয় তো বা কৃপার্দ্রচিত্তে আপনাদের মধ্যে এইরূপ বলাবলি করিতেন যে, "এরা খোট্টা মানুষ এদের সংস্কৃত উচ্চারণ কত আর ভাল হইবে।" আমাদের দেশের লোকের এটা জানা উচিত যে, দাক্ষিণাত্য প্রদেশ মুসলমানদিগের পরাক্রমের সংস্পর্শ হইতে অনেক পরিমাণে নির্লিপ্ত ছিল. এই জন্য যদি বিশুদ্ধ প্রাচীন ভারতবর্ষীয় সামগ্রী কোথাও থাকে তবে সেই সব অঞ্চলের গলিঘুজিতে লুকাইয়া থাকিবারই কথা। প্রাচীন ভারতবর্ষীয় নৃত্যগীত মুসলমান রাজাদের বৈঠকী নৃত্যগীত হইতে—খেয়াল ধ্রুপদ টপ্পা এবং বাইনাচ প্রভৃতি হইতে—অনেক বিভিন্ন ছিল—তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই; তাহার সাক্ষী—কালিদাসের বিক্রমোর্ব্বশী নাটকের গীতাংশের সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গেরই এমনিসব নূতন-তরো নাম যে—তাহাদের কাহার যে কি অর্থ তাহা এক্ষণকার গীতের বড় বড় ওস্তাদেরাও বলিতে পারেন না। এদেশের পুরাতন-প্রণালীর নৃত্যগীতকে লোকে যে ইউরোপীয় ঢঙের নৃত্য গীত বলিবে তাহাতে কিছুই বিচিত্র নাই; কেননা আর্য্য জাতিগণের গোড়ায় একতা বিদ্যমান ছিল ইহা যদি সত্য হয়, তবে তাহার অস্ফুট আভাস কালের পর্দার আড়াল থেকে মাঝে মাঝে চম্‌কানি দিবে—ইহা তো হইতেই পারে। আমাদের দেশের বিশুদ্ধ ভারতবর্ষীয় (অর্থাৎ অযাবনিক) গানের স্থর শুনিলে লোকে তাহা ধরিতে পারে না—ধরিতে না পারিলেই তাহাকে ইংরাজি স্থর বলিয়া খোঁটা দেয়; তেমনি আমাদের দেশের লোক আদিম কালের উপনিষদাদির পরিষ্কার ব্যাখ্যান শুনিলে তাহাকে আধ-খ্রীষ্টানি বলিয়া খোঁটা দেয়। আমরা এমনি অসাধারণ সমজদার লোক যে, আমাদের নিকটে পুরাণ-তন্ত্রাদির ধর্ম্মই সনাতন হিন্দুধর্ম্ম; বাস্তবিক সনাতন ধর্ম্ম যে উপনিষদাদির মথিত সারাংশ তাহা আমাদের নিকটে খ্রীষ্টান ধর্ম্মেরই সামিল।

অশ্বকে চালা'ন কিম্বা অশ্ব তাঁহাকে চালায়—তাহা বলা কঠিন! তাতে আবার সারথীও দশ গণ্ডা, অশ্বও দশ গণ্ডা; অশ্ব—নানা প্রদেশের নানা বিরোধী লোকাচার, সারথী নানা মুনির নানা বিরোধী শাস্ত্র; সারথীদিগের হাতের রাস আল্‌গা হইয়া লট্‌পট্‌ করিতেছে—তাহা যে তাঁহাদের হাত হইতে খসিয়া পড়ে নাই—এই ঢের! দশগণ্ডা ঘোড়া দশদিকে রুখিয়া পা ছোড়াছুড়ি করিতেছে—দশগণ্ডা সারথী সামাল্‌ সামাল্‌ বলিয়া চীৎকার করিতেছে—রথ-বেচারী কোন্‌দিকে যাইবে তাহা স্থির করিতে না পারিয়া যেখানকার সেইখানেই স্থির রহিয়াছে। রথের এইরূপ গতিরোধ অপ্রতীকার্য্য দেখিয়া আরোহীদিগের (অর্থাৎ ভারতবাসীদিগের) মনোরথেরও গতিরোধ হইয়া আসিতেছে—তাঁহাদের আশা ভরসা সকলি লোপ পাইয়া আসিতেছে।

আমাদের দেশের পূর্ব্বাপর ঐতিহাসিক রহস্যে একটু ডুব দিয়া তলাইয়া দেখিলেই আমাদের দেশের রোগের মূল যে কোন্‌খানটিতে তাহা চিকিৎসকের চক্ষে স্পষ্ট ধরা পড়িবে। রোগটি বড় সহজ নয়—তাহা পক্ষাঘাত বিশেষ।

বৈদিক সময়ে আমাদের দেশের পিতৃপুরুষদিগের মনে কৃত্রিমতার আবরণ যেমন ছিল না বলিলেই হয়, এখন আমাদের দেশে দেখিতে পাওয়া যায় ঠিক্‌ তার বিপরীত! এখন দেখিতে পাওয়া যায়—খাওয়া দাওয়া, ওঠা বসা, চলা ফেরা সকলই কৃত্রিম ধর্ম্মাবরণে আবৃত! কৃত্রিম শব্দের অর্থ এখানে কপট নহে; যাহা সহজ-শোভন নহে—যাহা কষ্ট-কল্পিত—তাহারই নাম কৃত্রিম—ইংরাজিতে যাহাকে বলে artificial। যেখানেই দেখিবে—কড়াক্কড় কৃত্রিম ধর্ম্মশাসনের বেশী বাঁধাবাঁধি আঁটাআঁটি, সেই-খানেই জানিবে বজ্রের বাঁধন ফস্কা গিরে;—অমুক বয়স হইতে

অমুক বয়স পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্য করিবে; অমুক বয়স হইতে অমুক বয়স পর্য্যন্ত অমুক দণ্ডে দেবারাধনা করিবে, অমুক দণ্ডে শ্রাদ্ধ তর্পণ করিবে, অমুক দণ্ডে অধ্যয়ন অধ্যাপন করিবে, অমুক দণ্ডে অতিথিসৎকার করিবে, অমুক বয়সে বনে যাইবে—বারো মাসে তেরো পার্ব্বণ করিবে—এইরূপ শক্তাশক্তি কৃত্রিম ধর্ম্মশাসনের ফল যাহা হইবার তাহাই হইয়াছে;—কি? না ছেলে-খেলা! তাহার সাক্ষী—বারো বৎসরের ব্রহ্মচর্য্য এক্ষণে তিন দিনে সাঙ্গ হইয়া যায়; সন্ধ্যাবন্দনা দেবারাধনা পিতৃতর্পণাদি কতকগুলি মুখস্থ শব্দ উচ্চারণ মাত্র; এবং পূজা উৎসবাদি আর কিছু নয়—পুরোহিতকে দিয়া কতকগুলি তন্ত্রোক্ত মন্ত্রতন্ত্র আওড়াইয়া লওয়া,—একপ্রকার রোজাকে দিয়া ভূত ঝাড়ানো!

যেমন বলিলাম—বৈদিক কালে—ঋষিদিগের দেবতা-স্তব তাঁহাদের হৃদয়ের অকৃত্রিম উচ্ছ্বাস ছিল; তাহা মুখস্থ চর্ব্বিত-চর্ব্বন ছিল না; তাঁহাদিগকে কেহই নাকে দড়ি দিয়া ঘুরাইয়া লইয়া বেড়াইত না। ক্রমে হইল অমুক সময়ে অমুক যজ্ঞে অমুক মন্ত্র পাঠ করিতে হইবে—অমুক যজ্ঞে অমুক প্রকার বেদী নির্ম্মাণ করিতে হইবে—অমুক যজ্ঞে এইরূপ পশু এবং এতগুলা পশু এইরূপে হত্যা করিতে হইবে—এইরূপ কত যে বাল্যক্রীড়া তাহার আর সীমা পরিসীমা নাই! বুদ্ধদেবের নাস্তিক্য অপবাদের কারণ আর কিছুই না—তিনি যাগযজ্ঞের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন; তা বই—তাঁহার প্রদত্ত ধর্ম্মোপদেশ পাঠ করিলে কখনই এ কথা কাহারো মনে তিলার্দ্ধও স্থান পাইতে পারে না যে, তিনি নাস্তিক ছিলেন। খুব সম্ভব যে, তিনি তৎকালের লৌকিক প্রথানুমোদিত ক্রিয়াকাণ্ডের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করাতে তাঁহার শিষ্যানুশিষ্যেরা সেইদিকে

আর একটু বেশী মাত্রা ঝোঁক দিয়াছিলেন, সেই গতিকে চারি-দিকে এইরূপ একটা মিথ্যা অপবাদ রটিয়া গেল যে, বুদ্ধদেব নাস্তিক। বুদ্ধদেবের তপস্যার প্রভাবে সার্ব্বলৌকিক এবং সার্ব্বকালিক ধর্ম্ম আমাদের দেশে সেই যা একবার চকি-তের ন্যায় বিকসিত হইয়াছিল—দেশ হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতীয় বন্ধন দূরীভূত হইয়া তাহার পরিবর্ত্তে ভারত-ব্যাপী দেশীয় ঐক্য-বন্ধন অভিব্যক্ত হইবার শুভযোগ সেই যা একবার দেখা দিয়াছিল! কিন্তু হইলে হইবে কি—তখনকার সেই সৌভাগ্যের কাল আমাদের দেশের ভাবি দুর্ভাগ্যের বীজ-বুনানির মুখ্য সময়—সাময়িক কার্য্য সময়ে হওয়া চাই—সেই মুখ্য সময়টিতে যদি দুর্ভাগ্যের বীজ-বুনানি না হইবে তবে আর কখন্ হইবে;—অতএব দেও বুদ্ধকে গলাধাক্কা দিয়া বাহির করিয়া—বুদ্ধের দলকে, বুদ্ধের ধর্ম্মকে, বুদ্ধের শাস্ত্রকে, বুদ্ধের কীর্ত্তিকলাপকে, দেশ হইতে দূর করিয়া দেও! যাগযজ্ঞের ধূমপটল আকাশে উত্থিত হউক! অনেক বৎসরের উপবাসের পরে দেবতাদিগের গৃহে গৃহে ভোজের ধূম লাগিয়া যা'ক্! ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু বরুণের শুষ্ক মুখ হর্ষ-কিরণে সমুজ্জ্বল হউক্! এইরূপ ব্রাহ্মণদিগের অমোঘ আশীর্ব্বাদে অতি অল্পদিনের মধ্যেই ভারতবর্ষের আধিব্যাধি নির্ব্যাধা হইয়া গেল—সার্ব্ব-লৌকিক ধর্ম্মের চিহ্ণ মাত্রও রহিল না—জাতির জাতিত্ব এবং কুলের কুলীনত্ব হিমালয় ছাড়াইয়া উঠিতে লাগিল! আবার আমাদের দেশ যে-কে-সেই! পুরাবৃত্তের অঙ্কুর গজাইতে সবেমাত্র যেই আরম্ভ করিয়াছে, আর অমনি তাহা প্রচণ্ড বিদ্বেষানলে দগ্ধ হইয়া তদ্দণ্ডেই শুখাইয়া মরিল। এক দিকে "আমি ব্রাহ্মণ আমি মস্ত লোক" "আমি ক্ষত্রিয়

আমি মস্ত লোক” এইরূপ কৌলিক বড়ত্ব, আর-এক দিকে “আমি শূদ্র আমি ক্ষুদ্র লোক” এইরূপ কৌলিক ছোটত্ব, এক দিকে প্রভাব-পক্ষীয় তাড়িত-প্রবাহ—আর-এক দিকে অভাব-পক্ষীয় তাড়িত-প্রবাহ—দুয়ের বেগাতিশয্যের মাঝখানে পড়িয়া জন-সমাজের হস্তপদ অসাড় হইয়া যাইতে লাগিল। এই-গতিকে পুরাবৃত্ত বলিয়া একটা যে বিজ্ঞান-সামগ্রী তাহা আমাদের দেশে জন্মিতেই অবসর পাইল না। কৃত্রিম খাঁচার ধর্ম্ম-বন্ধনে লোকের হাত পা বাঁধা থাকিলে কেহই স্বাধীন-ভাবে কোনো কার্য্য করিতে পারে না;—আর, যে কার্য্য স্বাধীন-ভাবে কৃত না হয়—পুরাবৃত্তের বাজারে সে কার্য্যের বিশেষ কোনো মূল্য থাকিতে পারে না। রাজারা প্রত্যুষ হইতে সায়াহ্ন পর্য্যন্ত কোন্ মুহূর্ত্তে কি কাজ করিবেন তাহা শাস্ত্রে সবিস্তরে বিধিবদ্ধ রহিয়াছে,—যে রাজা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তাহা মানিয়া চলিলেন, সেই রাজা অক্ষয় কীর্ত্তি লাভ করিলেন, আর, যিনি তাহার এক চুল এদিক্ উদিক্ করিলেন তিনি ধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট হইলেন! এইরূপ যেখানে কৌলিক প্রথা মানিয়া চলা-না-চলার উপরে রাজাদের সমস্ত খ্যাতি-অখ্যাতি যশ-অপযশ নির্ভর করে, সেখানে কাজেই জাতির গুণাগুণই ব্যক্তির গুণাগুণের একমাত্র পরিচায়ক এবং পরিমাপক হইয়া দাঁড়ায়। এরূপ অব-স্থায় কোনো ব্যক্তির নিজের কোনো স্বাধীন কীর্ত্তি ইতিহাসে প্রবেশ করিতে পথ পায় না। কালিদাসের রঘুবংশে সূর্য্যবংশীয় রাজাদিগের গুণ-বর্ণনায় যেমন দেখিতে পাওয়া যায়—“যথা-বিধিহুতাগ্নীনাং যথাকামার্চ্চিতার্থিনাং যথাপরাধদণ্ডানাং যথাকাল-প্রবোধিনাং রঘূনামন্বয়ং বক্ষ্যে তনুবাগ্‌বিভবোঽপি সন্” এই-রূপ শাস্ত্রীয় বন্ধনে বাঁধাসাঁধা কার্য্য ছাড়া, স্বাধীন-ভাবে কোনো

রাজা যদি খুব একটা ভাল কার্য্যও অনুষ্ঠান করেন, (যেমন বুদ্ধদেব করিয়াছিলেন), তবে তাহা এদেশের পুরাতন পথাবলম্বী ইতিহাস-লেখকের গ্রাহ্যের মধ্যেই আসিতে পারে না।

লোকের বড়ত্ব ছোটোত্বের দুইটি বিভিন্ন ধরণের পরিমাণ দণ্ড—জন্ম এবং কর্ম্ম; জাতি এবং কীর্ত্তি; ভূধাতু এবং কৃ ধাতু। আমাদের দেশে ভূধাতু কৃ-ধাতুর হাত পা বাঁধিয়া তাহাকে এমনি একটা কাটের পুতুল বানাইয়া তুলিয়াছে যে, আমাদের এখানে কৃ ধাতুকে লইয়া যত কিছু নাড়াচাড়া—যত কিছু ক্রিয়াকর্ম্মের আড়ম্বর—সমস্তই একপ্রকার পুৎলোবাজিরই সামিল। আগা-গোড়া সবই তারে-ঝোলানো কাটের পুতলের কাণ্ড—তা'র আবার ইতিহাসই বা কি আর পুরাবৃত্তই বা কি! কথাটি এই যাহা বলিলাম, ইহা আমার নিজের মনঃকল্পিত কথা নহে—ইহা শাস্ত্রেরই প্রতিধ্বনি। কৃত্রিম কর্ম্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে ঐরূপ মর্ম্মবেদনার দীর্ঘনিশ্বাস সকল শাস্ত্রেরই প্রাণের মধ্য হইতে ভূয়োভূয় বাহির হইতে দেখা যায়। দেখ না কেন—রাশি রাশি মুখস্থ শাস্ত্র-বচনের এবং অসংখ্য খুঁটিনাটির ভারে প্রপীড়িত হইয়া—কর্ম্ম এমন যে ভাল সামগ্রী, তাহাও আমাদের দেশে একপ্রকার যন্ত্রণা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমাদের দেশের শাস্ত্রানুশাসিত কৃত্রিম কর্ম্মকাণ্ড লোকের স্বাধীন স্ফূর্ত্তির এমনি ব্যাঘাত উৎপাদন করে যে, কি দর্শন কি পুরাণ কি তন্ত্র সকল শাস্ত্রই একবাক্যে কর্ম্মের নাম দিয়াছে—কর্ম্ম-বন্ধন। প্রতীচ্য ভূখণ্ডে আলস্য এবং জড়তাই বন্ধন বলিয়া লোকের নিকটে পরিচিত; তার সাক্ষী—shackles of indolence অবসাদের শিকল; আর, কর্ম্মই কেবল সেই জড়তার বন্ধন খুলিয়া দিতে পারে,—তা ছাড়া আর কেহই তাহা পারে না। কিন্তু আমাদের দেশে একি বিপরীত—কর্ম্ম নিজেই বন্ধন বলিয়া

পরিগণিত হয়! যিনি বন্ধন খুলিয়া দিবেন তিনি নিজেই যদি বন্ধন হইলেন—যিনি রক্ষক তিনিই যদি ভক্ষক হইলেন—তবে আর বিপন্ন ব্যক্তির উদ্ধারের উপায় কি? কর্ম্ম-মাত্রই যদি বন্ধন হয় তবে কর্ম্ম-বন্ধন হইতে মুক্ত হইবার জন্য কর্ম্ম করিলে দ্বিতীয় কর্ম্মটিও বন্ধন হইয়া দাঁড়ায়। যদি বলো সংসারের কর্ম্ম-বন্ধন ঘুচাইবার জন্য তপজপাদির সাধন আবশ্যক, তবে তপজপাদি কর্ম্মের বন্ধন ঘুচাইবার জন্য তৃতীয় কর্ম্ম সাধনের আবশ্যকতা অস্বীকার করিতে পারো না; কেননা—তুমি বলিয়াছ কর্ম্মমাত্রই বন্ধন; তপজপাদি না হয় সোণার বন্ধন, চুরি-ডাকাতি না হয় লোহার বন্ধন; কিন্তু বন্ধন দুইই। হদ্দ তুমি এই পর্য্যন্ত বলিতে পার যে, সৎ কর্ম্ম করিলে অসৎ কর্ম্মের লোহার শৃঙ্খল খুলিয়া গিয়া তাহার স্থানে সোণার শৃঙ্খল জড়ানো হয়; কিন্তু তাহাতে কি? লোহার শৃঙ্খলের পরিবর্ত্তে সোণার শৃঙ্খল জড়ানোকে কিছু আর মুক্তিসাধনের উপায় বলা যাইতে পারে না। একটা পক্ষীকে লোহার পিঞ্জর হইতে বাহির করিয়া আনিয়া সোণার পিঞ্জরে বদ্ধ করিয়া রাখিলে তাহাকে কিছু আর মুক্তি দেওয়া হয় না। অতএব এ কথা যদি সত্য হয় যে, কর্ম্ম-মাত্রই কর্ম্ম-বন্ধন, তবে অগত্যা এইরূপ দাঁড়ায় যে, মুক্তির জন্য যতই যিনি সাধ্য-সাধনা করিবেন ততই তিনি বন্ধনে জড়িত হইয়া পড়িবেন। যে ব্যক্তি সাঁতার জানে না সে যেমন জলে পড়িলে কূলে ফিরিয়া আসিবার জন্য যতই হাত পা ছোড়াছুড়ি করে ততই দূরে দূরে ভাসিয়া যায়—হাত পা না ছুড়িলে নীচে তলাইয়া যায়; তেমনি, মুক্তির জন্য সাধনা করিলেও কর্ম্মবন্ধন—না করিলেও স্বভাব-সুলভ সংসার-বন্ধন—বন্ধনের হস্ত হইতে কিছুতেই পরিত্রাণ নাই। ভাবিয়া

দেখিলে দাঁড়ায় এই যে, "কর্ম্মমাত্রই কর্ম্মবন্ধন" এটা কেবল একটা অত্যুক্তি-অলঙ্কার; শাস্ত্রের প্রকৃত অভিপ্রায় তাহা নহে। শাস্ত্রে কেবল দুইরূপ কর্ম্ম কর্ম্মবন্ধন বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে—(১) কাম্য কর্ম্ম অর্থাৎ ফল-কামনা করিয়া যে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয় যেমন যাগযজ্ঞাদি; (২) নিষিদ্ধ কর্ম্ম যেমন চুরিডাকাতি। এ ভিন্ন তৃতীয় আর-এক প্রকার কর্ম্ম আছে;—কি? না নিষ্কাম কর্ম্ম; শাস্ত্রে বলে—আর যুক্তিতেও তাহাই প্রতিপন্ন হয়—যে, এই তৃতীয় শ্রেণীর কর্ম্ম (নিষ্কাম কর্ম্ম) বন্ধনের কোটায় স্থান পাইতে পারে না।

আমাদের দেশের প্রবীণ পরামর্শদাতাদিগের সিদ্ধান্ত এই যে, মুখে অথবা হাতে কাম্য কিম্বা নিষিদ্ধ কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিয়া মনে তাহাকে আমল না দিলেই—তাহা নিষ্কাম কর্ম্মের পদবীতে সমুত্থান করে! ইঁহারা বলেন—এই বিড়াল বনে গেলেই যেমন বন-বিড়াল হয়, তেমনি কাম্য অথবা নিষিদ্ধ কর্ম্ম নিষ্কাম-ভাবে কৃত হইলেই তাহা নিষ্কাম কর্ম্ম হইয়া দাঁড়ায়; তা ছাড়া—নিষ্কাম কর্ম্ম বলিয়া স্বতন্ত্র শ্রেণীর কোনো কর্ম্ম নাই! শাস্ত্রে কিন্তু আর এক কথা বলে—সকল শাস্ত্রেই বলে যে, কায়মনোবাক্যের একতা নিষ্কাম এবং সকাম উভয়-বিধ ধর্ম্মেরই—ধর্ম্মমাত্রেরই—একটি প্রধান পরিচয়-লক্ষণ; তা বই—মুখে এক, মনে আর অথবা কাজে আর—এ-ভাবের কার্য্য ধর্ম্মই নহে;—না তাহা কাম্য কর্ম্ম—না তাহা নিষ্কাম কর্ম্ম; তাহা নিষিদ্ধ কর্ম্মেরই শ্রেণী-ভুক্ত। চতুর পরামর্শদাতাকে একজন খাঁটি শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি এইরূপ বলিতে পারেন যে, "তুমি বলিতেছ—মুখে পুত্রং দেহি ধনং দেহি এবং মনে 'কিছু দিতে হবে না মা—ছেড়ে দেহি' ইহারই নাম নিষ্কাম কর্ম্ম!—মানিলাম যে, তোমার মনের মধ্যে ধনের

কামনা নাই—পুত্রের কামনা নাই, যশের কামনা নাই; কিন্তু মায়া-ভক্তি দেখাইয়া লোকের মন ভুলাইবার কামনা আছে তো! এটা তো আর তুমি অস্বীকার করিতে পারিবে না!” আমরা তাই বলি যে, নিষ্কাম কর্ম্ম কাম্য এবং নিষিদ্ধ উভয় শ্রেণীর কর্ম্ম হইতে ভিন্ন—তৃতীয় আরেক শ্রেণীর কর্ম্ম। কাম্য এবং নিষিদ্ধ কর্ম্মের মূল-প্রবর্ত্তক—সংসারাসক্তি; নিষ্কাম কর্ম্মের মূল প্রবর্ত্তক—বৈরাগ্য, অথবা যাহা একই কথা—ভগবদ্ভক্তি।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় নিষ্কাম-কর্ম্ম—ভূয়োভূয় উপদিষ্ট হইয়াছে। ফলাফলের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া শুদ্ধ কেবল কর্ত্তব্যবোধে যে কর্ম্ম কৃত হয়, তাহারই নাম নিষ্কাম কর্ম্ম। যথা;—ভগবদ্গীতা বলেন “কার্য্যমিত্যেব যৎকর্ম্ম নিয়তং ক্রিয়তেঽর্জ্জুন সঙ্গংত্যক্ত্বা ফলঞ্চৈব সত্যাগো সাত্ত্বিকো মতঃ!” “কর্ত্তব্য” এইরূপ বোধে বিষয়াসক্তি এবং ফল-কামনা পরিত্যাগ করিয়া যে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাহারই নাম—সাত্ত্বিক ত্যাগ। ফল-কামনা-শূন্যতা এবং বৈরাগ্য—কথা একই কেবল ভাষা ভিন্ন।

ফল-কামনা-শূন্যতা এবং বৈরাগ্যের নাম শুনিলে অনেকে মনে করেন যে, তাহার মধ্যে রস কস কিছুই নাই, তাহার শরীর কাষ্ঠ পাষাণে গঠিত। তাঁহারা ভাবেন, বৈরাগ্য শব্দের অর্থই হ’চ্চে অনুরাগের ঠিক্ উল্টো—মুখ-শিট্‌কোনো বিরাগ! কিন্তু ভিতরের নিগূঢ় বৃত্তান্ত যাঁহারা জানেন তাঁহাদের কাছে, বৈরাগ্য অনুরাগ সোপানের সর্ব্বোচ্চ মঞ্চ; তাঁহাদের কাছে—বৈরাগ্যের আগাগোড়া সবই অনুরাগ—বৈরাগ্য অনুরাগ ছাড়া আর কিছুই নহে। জল যেমন অগ্নিতে পরিশুদ্ধ হইলেই বাষ্পাকারে আকাশে সমুত্থিত হয়, অনুরাগ তেমনি জ্ঞানানলে পরিশুদ্ধ হইলেই বৈরাগ্যের মুক্ত সমীরণে সমুত্থিত হয়। লোকের মনে এইরূপ বিশ্বাস যে,

বৈরাগ্যের পথ অবলম্বন করা, আর সর্ব্বত্যাগী হওয়া, একই কথা; এ কথাটির মধ্যে সত্য কেবল এইটুকু যে, বৈরাগ্যের পথ অবলম্বন করিতে হইলে অভিনবব্রতীকে কিছু না কিছু ত্যাগ স্বীকার করিতেই হয়; কিন্তু ত্যাগ স্বীকারের একটি গোড়ার কথা এখানে ভুলিলে চলিবে না—সেটি এই যে, লোকে ত্যাগ স্বীকার করিব বলিয়া ত্যাগ স্বীকার করেও না—করিতে পারেও না। ত্যাগ স্বীকার যিনি যখন করেন, তখন, একটা বিষয়ের ভালবাসা সূত্রেই আর-একটা বিষয়ের ত্যাগ স্বীকার করেন; কেহ বা পরিবারের মঙ্গলার্থে ত্যাগ স্বীকার করেন, কেহ বা কুলের মঙ্গলার্থে, কেহ বা দেশের মঙ্গলার্থে, কেহ বা সাধারণতঃ মনুষ্যের মঙ্গলার্থে। যে বিষয়ের ত্যাগ স্বীকার করা হইতেছে তাহার প্রতি বৈরাগ্যের উৎপত্তি এবং যাহার জন্য ত্যাগ স্বীকার করা হইতেছে তাহার প্রতি অনুরাগের টান, এ দুই ব্যাপার ছায়াতপের ন্যায় পরস্পর-সাপেক্ষ——অর্থাৎ দুয়ের একটিকে ছাড়িয়া আর একটি একাকী থাকিতে পারে না।

অনুরাগের সহিত বৈরাগ্যের যখন এইরূপ মাখামাখি সম্বন্ধ তখন অনুরাগের অবতারণা-ব্যতিরেকে বৈরাগ্যের আলোচনা কখনই সুসম্পন্ন হইতে পারে না ইহা বুঝিতেই পারা যাইতেছে; এই জন্য আমরা প্রথমে অনুরাগের কতগুলা সিঁড়ির ধাপ, এবং কাহার উপরে কোন্‌টি সমুত্থিত, তাহার পর্য্যালোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি; তাহার পরে সেই সিঁড়ি ভাঙিয়া কিরূপে বৈরাগ্য-মঞ্চে উত্থান করিতে হয়, তাহার সন্ধান পাওয়া যাইতে পারিবে।

অনুরাগ-সোপানের গোড়া হইতে শেষ পর্য্যন্ত এই কয়টি পংক্তি, অর্থাৎ পঁইটে, উপর্য্যুপরি সাজানো রহিয়াছে;—(১)

প্রাণানুরাগ অর্থাৎ আপনার শারীরিক প্রাণের প্রতি অনু-রাগ; (২) গৃহানুরাগ অর্থাৎ পরিবারের প্রতি অনুরাগ (পরি-বার একপ্রকার মানসিক প্রাণ ইহা বলা বাহুল্য); (৩) কুলানুরাগ অর্থাৎ আত্মীয় স্বজন জ্ঞাতি গোষ্ঠীর প্রতি অনু-রাগ; (৪) দেশানুরাগ; (৫) সর্ব্বভৌমিক অনুরাগ অর্থাৎ সার্ব্ব-দৈশিক মনুষ্যের প্রতি অনুরাগ; (৬) ঈশ্বরানুরাগ। এই অনু-রাগ সোপানে—যিনি যেমন ব্যক্তি তিনি সেইরূপ পংক্তিতে অব-স্থিতি করেন; কেহ বা নীচের পংক্তিতে অবস্থিতি করেন, কেহবা উপরের পংক্তিতে অবস্থিতি করেন; আবার, প্রত্যেক ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন পংক্তিতে অবস্থিতি করেন। নীচের পংক্তির লোক বড় জোর একধাপ উচ্চ পংক্তির লোকের ভাব বুঝিতে পারে; তা বই, দুই তিন ধাপ উচ্চ পংক্তির লোকের—ভাব বুঝিতে পারা দূরে থাকুক—ভাষাই বুঝিতে পারে না। ইহুদীরা যৎকালে স্বজাতীয় অনুরাগের গণ্ডির মধ্যে অবরুদ্ধ ছিল, ঈসা তখন সার্ব্বলৌকিক মনুষ্যানুরাগের মঞ্চ হইতে তাহাদিগকে কত না সদুপদেশ প্রদান করিলেন—সমস্তই ভস্মে ঘৃতাহুতি হইল। একই অভিন্ন কারণে ঈসাকে ইহুদীরা এবং বুদ্ধদেবকে ভারত-বাসীরা নিতান্তই পর ভাবিল; সে কারণ আর কিছু না—নীচের পংক্তির লোক দুই তিন ধাপ উচ্চ পংক্তির লোকের ভাবও বুঝিতে পারে না—ভাষাও বুঝিতে পারে না। বুদ্ধ-দেবকে লোকে তো নাস্তিক বলিয়া উড়াইয়াই দিল—তাঁহার অপরাধ এই যে, তিনি বেদোক্ত যাগযজ্ঞের অলীকতা ঘোষণা করিয়া ইন্দ্রচন্দ্রাদি দেবতাগণকে হাতে না মারিয়া ভাতে মারি-বার চেষ্টা পাইয়াছিলেন! কোনো কোনো পুরাতত্ত্ববিৎ অনুমান করিয়া থাকেন যে, ঈসার ধর্ম্ম বৌদ্ধ ধর্ম্মেরই একটি প্রচ্ছন্ন উপ-

শাখা; সে যাহাই হৌক্—দোঁহার প্রবর্ত্তিত দুই সার্ব্বলৌকিক ধর্ম্ম পৃথিবীর দুই মধ্যস্থান হইতে দুই প্রান্ত-স্থানে ছট্‌কিয়া পড়িল—বুদ্ধের ধর্ম্ম পূর্ব্ব প্রান্তে ছট্‌কিয়া পড়িল—ঈসার ধর্ম্ম পশ্চিম প্রান্তে ছট্‌কিয়া পড়িল।

আর, পৃথিবীর সেই দুই প্রান্তেই লোকেরা স্বাধীন রাজ্যে বাস করিয়া সম্মানের সহিত জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে, ইহা আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি। শুধু ইতিহাস দেখিলে কি হইবে—ইতিহাসের রহস্যটির ভিতর একবার একটু মনোযোগের সহিত তলাইয়া দেখো;—তাহা হইলে দেখিতে পাইবে যে, একই অপরাধে ঈসা ক্রুসে বিদ্ধ হইলেন এবং বুদ্ধ সশরীরে না হউক্ সদলে দ্বীপান্তরিত হইলেন। সে অপরাধ আর কিছু না—লোকদিগকে কৃত্রিম ধর্ম্ম-বন্ধন হইতে মুক্তি প্রদান করিয়া তাহাদের স্বাধীনতা সমর্থন করিতে যাওয়া! যাগ-যজ্ঞাদি অলীক ক্রিয়াকাণ্ডের বন্ধন মোচন করিয়া ভারতবাসী লোকদিগকে আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা প্রদান করা বুদ্ধের হৃদ্গত সংকল্প ছিল, এবং ফারিসীয় সম্প্রদায়ের কৃত্রিম ধর্ম্মশাসনের শৃঙ্খল ছেদন করিয়া ইহুদী জাতিকে আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা প্রদান করা ঈসার হৃদ্গত সংকল্প ছিল। কিন্তু কালের কঠোর শাসনে বুদ্ধের ধর্ম্ম ভারতবর্ষের স্বাধীনতার মূল উৎপাটন করিয়া লইয়া ভারতবর্ষ হইতে বিদায় গ্রহণ করিল—ঈসার ধর্ম্ম ঘূর্ণাবায়ুর ন্যায় ইহুদী জাতিকে উড়াইয়া ছড়িভঙ্গি করিয়া জেরুসালেমকে শ্মশান করিয়া ফেলিল।

যে দিন বুদ্ধের ধর্ম্ম ভারতী মাতার ক্রোড় শূন্য করিয়া পূর্ব্ব-সাগরে ঝম্প প্রদান করিল, সেই দিন মাতা ভারতী রোষে অধীর হইয়া প্রকম্পিত অধরে তাঁহার দুর্ব্বুদ্ধি সন্তানগণকে বলি-

লেন—"বুদ্ধ-দেব তোমাদিগকে ভালবাসিয়া তোমাদের হস্ত পদ হইতে কৃত্রিম কর্ম্মকাণ্ডের বন্ধন মোচন করিয়া তোমাদের মৃত শরীরে জীবন সঞ্চার করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন—তাই তোমরা তাঁহাকে দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলে!—বুঝিয়াছি—তোমরা মুক্তি চাও না—তোমরা চাও বন্ধন! তথাস্তু! তোমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হউক্! স্বাধীনতা তোমাদের অত্যাচার হইতে পলাইয়া বাঁচিয়া অস্পর্শীয় ম্লেচ্ছদিগের গৃহ উজ্জ্বল করুক্! যেমন তোমরা বন্ধন-প্রিয়—তেমনিই তোমাদের দশা হউক্—সেই ম্লেচ্ছদিগের দাসত্ব-শৃঙ্খল জন্ম-জন্ম তোমাদের কণ্ঠের হার হউক্!" দেখিতে না দেখিতে ভারতের প্রলয়-মেঘ মুসলমান-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া পূর্ব্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ জুড়িয়া তলোয়ারের বিদ্যুৎক্রীড়া এবং মস্তকের শিলাবৃষ্টি আরম্ভ করিল—সেই এক দিন! এবং তাহার পরে গৌরাঙ্গ দেবতারা বজ্রধ্বনিতে দশদিক্ ফরসা করিয়া লোকের চক্ষে ভরসা আনয়ন করিলেন—এই একদিন; এইরূপে (দেশের অন্ধীভূত নয়নে কিবা-রাত্র কিবা-দিন!) রাত্রি এবং দিন উল্টিয়া পাল্টিয়া ভয়-আশা এবং আশা-ভয় সঞ্চার করিতে লাগিল। বন্ধন যেমন হইতে হয় তাহাই আমাদের হইয়াছে—কিন্তু তাহাতেও আমাদের আশ মিটিতেছে না; আমরা আরো বন্ধন চাই—আরো বন্ধন চাই! আবার আমরা গাঁয়ে মানুক না মানুক্ আপনি মণ্ডল হইয়া কৃত্রিম কর্ম্মকাণ্ডের বন্ধন যেখানে একটু আধটু আল্গা হইয়াছে দেখিতেছি সেখানে তাহার গিরা শক্ত করিয়া আঁটিয়া দিবার জন্য কোমর বাঁধিয়া লাগিতেছি। যদি আমাদিগকে কার্য্য-গতিকে সমুদ্র যাত্রা করিতে হয়, তবে মৃত শাস্ত্রকে ধরিয়া তুলিয়া বসাইয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার মুখের দিকে হাঁ করিয়া তাকাইয়া থাকা

চাই—তাকাইয়া না থাকিলেই নয়—তাহা অবশ্য কর্ত্তব্য! মৃত শাস্ত্র কি আর বলিবে—তাহার পিছনে লুকাইয়া থাকিয়া পাণ্ডারা বলেন "হাঁ সমুদ্র যাত্রা করিতে পার—তবে কি না—" ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি! ইহাঁদের এইরূপ দুই নায়ে পা দেওয়া ভাবাকে—যদি কিন্তু তবে-কিনা প্রভৃতিকে—যাঁহারা অব্যর্থ বেদ-বাক্য মনে করেন, তেমন লোক আজিকের বাজারে খুবই কম;—বাঙ্গালা মুলুকে তো নাই-ই—সমগ্র ভারতবর্ষে আছে কি না সন্দেহ! এসব হ'চ্চে আর কিছু না—ইংরাজিতে যাহাকে বলে Policy! কখনো কখনো যেমন দেখা যায় যে, ডাক্তারের পরামর্শ শুনিয়া মদ্যপায়ী ব্যক্তি মদ ছাড়িয়া আফিম ধরে—অবশেষে মদও চলিতে থাকে, আফিমও চলিতে থাকে;—ইহাঁদের পালিসীও তেমনি! উনবিংশ শতাব্দীয় সভ্যতার কৃত্রিম বন্ধন এড়াইবার মানসে ইহাঁরা শাস্ত্রীয় কৃত্রিম বন্ধনের গিরা শক্ত করিয়া আঁটিবার জন্য বিস্তর আয়াস পাইতেছেন। ইহাতে ফল হইতেছে এই যে, দুই কৃত্রিম বন্ধন পরস্পরের পানে চোক টেপাটিপি করিয়া শেয়ানে শেয়ানে কোলাকুলি করিতেছে! শাস্ত্রীয় বন্ধনের পাণ্ডারা বলিতেছেন যে, "আমাদের আশ্রিত অনুগত থাকিয়া আমাদের নিকট হইতে ব্যবস্থা লইয়া বিলাতে যাইতে পার—খানা খাইতে পার—সবই করিতে পার, তাহার জন্য চিন্তা কি!" উনবিংশতীয় বন্ধনের পাণ্ডারা বলেন যে—"গোবরের বটিকা দশ গ্রেণের পরিবর্ত্তে এক গ্রেণ এবং তাহার অনুপান সেরভর সুপ—এইরূপ ব্যবস্থা হইলেই ভাল হয়! তাহাই অনুমতি হোক্।" শাস্ত্রীয় বন্ধনের পাণ্ডারা পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করিয়া বলেন—"তা সেরূপ ব্যবস্থা আমরা দিতে না পারি এমন নয়—তবে কি না—! যা'ই হোক্—তুমি দুর্ব্বল অধিকারী—তোমার

জন্য—সকলের জন্য নয় শুধু কেবল তোমার জন্য—আমরা তোমার ইচ্ছানুযায়ী ঐরূপ ব্যবস্থা দিতে কোনো হানি বোধ করি না—অতএব তথাস্তু!” এরূপ পলিসী পাড়াগেঁয়ে দলাদলিতে খুবই কাজে লাগিতে পারে ইহা আমি বিলক্ষণই জানিতেছি; কিন্তু এটাও তেমনি জানিতেছি যে,—এরূপ পলিসীতে ভারত উদ্ধার করিতে যাওয়া এক আধ ছিলিমের কর্ম্ম নহে! ইহাঁদের পালিসীর আর এক উদ্দেশ্য এই যে, যেখানে বল নাই সেখানে বলের একটা প্রতিমূর্ত্তি খাড়া করিয়া কৌশলে কার্য্যোদ্ধার! মানিলাম যে, একটি কচি বালককে সোলার সাপে ভয় দেখানো যাইতে পারে, ইহা খুবই সত্য; কিন্তু সেই সত্যের উপরে নির্ভর করিয়া বিস্‌মার্ক বোনাপার্ট এবং প্রভু ক্লাইবের চেলাদিগকে তেমনি করিয়া ভয় দেখাইতে যাওয়া—পালিসীটা কিছু যেন অতিরিক্ত মাত্রা বলিয়া বোধ হয়! পৃথিবীতে যে সময়ে উন্নত বিজ্ঞান দর্শন শিল্প সাহিত্যের জ্ঞানানল-শিখা দিন দিন উর্দ্ধ হইতে উর্দ্ধে সমুত্থান করিয়া যোজন যোজন দূরে জ্যোতির্ম্মণ্ডল বিস্ফারিত করিতেছে—সেই সময়ের এই প্রকট দিবালোকে ইঁহারা স্বচ্ছন্দে কতকগুলা জরাজীর্ণ কঙ্কালাবশিষ্ট কৃত্রিম কর্ম্মকাণ্ড—যাহার প্রাণ যাহাকে ফেলিয়া পালাইয়া অনেক কাল হইল প্রেতলোকে ঘর বাড়ি ফাঁদিয়া সুখে বসবাস করিতেছে—মর্ত্ত্যে ফিরিয়া আসিবার নামও করে না—সেই শবদেহটাকে বীর পরিচ্ছদে সাজাইয়া তাহাকে জলন্ত সত্যের অভিমুখে ধাক্কা মারিয়া অগ্রসর করিয়া দিতেছেন, এবং আপনারা দশ হাত পিছাইয়া দাঁড়াইয়া—উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছেন “ভ্যালা মোর বাপ—মুখের এক ফুঁয়ে ঐ আলোটা নিভিয়ে দে—এক ফুঁয়ে!” বুদ্ধদেব এবং তাঁহার পূর্ব্বে উপনিষদ্‌প্রণেতা ঋষিগণ কৃত্রিম কর্ম্মকাণ্ডের পেষণ-যন্ত্র হইতে

লোকদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য পরাকাষ্ঠা তপস্যা এবং ত্যাগ স্বীকার করিয়াছিলেন; কিন্তু নব্য হিঁদুয়ানির আপনি-মণ্ডল মহোদয়েরা যাঁহারা সংস্কৃত-ভাষার উচ্চারণ পর্য্যন্ত জানেন না, তাঁহারা প্রাচীন শাস্ত্রকে দিব্য একটি সরস নারিকেল পাইয়া—তাহার শাঁস কোনো কাজের হইল না—জল কোনো কাজের হইল না—তাহার গাত্র হইতে রাশি রাশি ছোবড়া সংগ্রহ করিতেছেন, আর, তাহারই দড়ি পাকাইয়া দেশের লোকের হাত পা বাঁধিবার কঠিন বন্ধন প্রস্তুত করিতেছেন; এমনি আড়ম্বরের সহিত তাহা করিতেছেন যে, দেখিলে মনে হয়—কত না জানি দেশের উপকার-সাধন হইতেছে— টিকিহীন মস্তকে টিকি গজাইতেছে—ফোঁটাহীন ললাটে ফোঁটা আবির্ভূত হইতেছে—বিলাত-ফের্ত্তারা গোবর খাইয়া তাহার প্রথম অক্ষর দিয়া মুখ-শোধন করিতেছেন—দেশের উপকার ইহা অপেক্ষা অধিক আর কি হইতে পারে? ইঁহারা এই এতগুলা ব্যক্তি—আর জন্মিয়াছিলেন রামমোহন রায় একাকী একজন—দোঁহার দুইরূপ বিভিন্ন-শ্রেণীর কার্য্য তুলনা করিয়া দেখিলে কি মনে হয়? মনে হয় যে—অসংখ্য তৃণরাশি স্তূপাকারে সজ্জিত হইলেও তালগাছের মস্তক নাগাল পায় না। যে কারণে প্রাচীন ভারত বুদ্ধদেবকে চিনিল না—ইহুদীরা ঈসাকে চিনিল না—সেই কারণেই বা রামমোহন রায়ের স্মৃতি তাঁহার প্রিয় জন্মভূমিকে ছাড়িয়া ইউরোপ আমেরিকার হৃদয়াভ্যন্তরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে! এরূপ হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? তাঁহার বিশ্ব-ব্যাপী মহান্ হৃদয়কে স্বদেশের বিদ্যা-দিগ্‌গজ পণ্ডিতেরা যখন সহস্র বাহু প্রসারণ করিয়াও আঁকড়িয়া পাইলেন না, তখন তাঁহারা আপনাদের অপদার্থতা ঢাকিবার জন্য স্ব স্ব সংকীর্ণ কোটরের মধ্যে প্রবেশ

করিয়া বলাবলি করিতে লাগিলেন "ওটা বিধর্ম্মী—ওকে দূর করিয়া দেও!" এবং সুযোগ পাইলে আজিও আপনি-মণ্ডলের দল ঐ কথার পুনঃ পুনঃ প্রতিধ্বনি করিতে ত্রুটি করেন না!

এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, অনুরাগ-সোপানে যাঁহারা পশ্চাদ্‌বর্ত্তী লোকদিগের নাগাল ছাড়াইয়া বেশী উচ্চ পংক্তিতে অবস্থিতি করেন, তাঁহারা সেই পশ্চাদ্‌বর্ত্তী ভ্রাতাদিগকে আপনাদের উচ্চ মঞ্চে উঠাইয়া লইবার জন্য নীচে হাত বাড়াইলে লাঞ্ছনা গঞ্জনার ধূলা কাদা ইঁট পাট্‌কেল তাঁহাদের অঙ্গের ভূষণ হয়।

অনুরাগ সোপানের যিনিই যত উচ্চ পংক্তিতে অবস্থিতি করুন্ না কেন—একটি নিয়ম কিন্তু সকলেকেই মানিয়া চলিতে হয়; সেটি এই যে, নীচের পঁইটা না মাড়াইয়া উপরের পঁইটায় পদ-নিক্ষেপ করা কাহারো সাধ্যায়ত্ত নহে। যদি দেখি যে, একই সময়ে দুই ব্যক্তি যাত্রারম্ভ করিয়াছে অথচ একজন চতুর্থ পংক্তিতে—আর এক জন দ্বিতীয় পংক্তিতে, তবে আমি বলিব যে, প্রথম ব্যক্তির গতির বেগ দ্বিতীয় ব্যক্তির অপেক্ষা দ্বিগুণ; তা বই—এরূপ কথা বলিব না যে, প্রথম ব্যক্তি দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পঁইটা ডিঙাইয়া এক মুহূর্ত্তে চতুর্থ পঁইটায় উপনীত হইয়াছে। অনুরাগের ক্রমাভিব্যক্তির একটি ধারা-বাহিক প্রকরণ পদ্ধতি আছে—তাহা এই;—

যে কোনো ধাপের অনুরাগ যখনই অভিব্যক্ত হয়, তখন তাহার নীচের নীচের ধাপের কোনো অনুরাগই মরে না—কেহ বা এক পুরু, কেহ বা দুই পুরু, কেহ বা তিন পুরু, স্তরের নীচে জিয়োনো থাকে এবং জিয়োনো থাকিয়া ভিতরে ভিতরে কার্য্য করে। দেশানুরাগী ব্যক্তির দেশানুরাগের উত্তাপে

তাহার কুলানুরাগ এবং গৃহানুরাগ শুথাইয়া মরে না—বরং পূর্ব্বাপেক্ষা নবতর এবং কল্যাণতর বেশ ধারণ করে। যোদ্ধা বীর যখন যুদ্ধের পূর্ব্বরাত্রিতে সমর-ক্ষেত্রের পার্শ্ববর্ত্তী কোনো একটি চৌকি-পাহারা-স্থানে ঘুমাইয়া বাড়ির স্বপ্ন দেখে, তখন তাহার গৃহানুরাগ কেমন উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে! তাহার পর দিন প্রত্যূষে রণ-ভেরীর তীব্র নিনাদে তাঁহার নিদ্রা ভাঙিয়া গিয়া তিনি যখন শয্যা হইতে লম্ফ দিয়া উঠেন, তখন বটে তাঁহার দেশানুরাগ উত্তেজিত হইয়া উঠিয়া গৃহানুরাগকে পশ্চাতে যাইতে বলে;—কিন্তু তখনও গৃহানুরাগ দেশানুরাগের বক্ষ-প্রাচীরের আড়ালে থাকিয়া বীরের সশস্ত্র বাহুতে মন্ত্রপূত অদৃশ্য তাগা এবং ইষ্ট-কবচ চুপিচুপি বাঁধিয়া দিতে থাকে।

অনুরাগের ক্রমাভিব্যক্তির নিয়ম এই যে, প্রথমে নীচের ধাপের অনুরাগ বিকসিত হয়;—নীচের ধাপের অনুরাগ যখন বিকসিত হয়, তখন উপরের ধাপের অনুরাগ বিকাশোন্মুখ থাকে; তাহার পরে নীচের ধাপের সেই বিকাশ-প্রাপ্ত অনুরাগের মধ্য হইতে সার আকর্ষণ এবং অসার পরিবর্জ্জন করিয়া উপরের ধাপের সেই বিকাশোন্মুখ অনুরাগ ক্রমে ক্রমে বিকসিত হইয়া উঠে। যেমন দেখা যায় যে, মৃত্তিকার রসপান করিয়া বৃক্ষের মূল বর্দ্ধিত হয়, মূলের রস পান করিয়া অঙ্কুর বর্দ্ধিত হয়, অঙ্কুরের রস পান করিয়া শাখা বর্দ্ধিত হয়, শাখার রসপান করিয়া বৃন্ত বর্দ্ধিত হয়, বৃন্তের রস পান করিয়া পত্র পুষ্প ফল বর্দ্ধিত হয়; তেমনি, গৃহানুরাগ প্রাণানুরাগের খাইয়া মানুষ, কুলানুরাগ গৃহানুরাগের খাইয়া মানুষ, দেশানু-রাগ কুলানুরাগের খাইয়া মানুষ, সার্ব্বদেশিক মনুষ্যানুরাগ দেশানুরাগের খাইয়া মানুষ; ঈশ্বরানুরাগ সকলকেই আত্মসাৎ

করিয়া সকলকেই ছাড়াইয়া উঠে। ইহার মধ্যে গুরুতর একটি মন্তব্য কথা এই যে, একদিকে যেমন বৃক্ষের মূল নীচে হইতে উপরে রস-প্রবাহ সঞ্চারিত করিয়া বৃক্ষের সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পরিপোষণ করে এবং আর একদিকে যেমন পল্লব-পুঞ্জ উপর হইতে আলোক শোষণ করিয়া সেই সঞ্চারিত রস-প্রবাহ পরিশোধন করে; তেমনি, নীচের ধাপের অনুরাগ উপরের ধাপের অনুরাগকে পরিপোষণ করে, উপর-ধাপের অনু-রাগ নীচের ধাপের অনুরাগকে পরিশোধন করে। প্রাণানুরাগ গৃহানুরাগকে পরিপোষণ করে, গৃহানুরাগ প্রাণানুরাগকে পরি-শোধন করে; গৃহানুরাগ কুলানুরাগকে পরিপোষণ করে, কুলা-নুরাগ গৃহানুরাগকে পরিশোধন করে; কুলানুরাগ দেশানুরাগকে পরিপোষণ করে, দেশানুরাগ কুলানুরাগকে পরিশোধন করে; সমস্ত অনুরাগ ঈশ্বরানুরাগকে পরিপোষণ করে, ঈশ্বরানুরাগ সমস্ত অনুরাগকে পরিশোধন করে। নীচের ধাপের অনুরাগ উপরের ধাপের অনুরাগ-দ্বারা পরিশোধিত না হইলে তাহা বিষাক্ত হইয়া উঠে; আর, এইরূপ বিষাক্ত অনুরাগকেই আমরা বলি—বিষয়াষক্তি অথবা কাম; পক্ষান্তরে, নীচের ধাপের অনুরাগ যখন উপরের ধাপের অনুরাগ দ্বারা পরিশোধিত হইয়া নির্ব্বিষ হয়, তখন তাহাকেই আমরা বলি প্রেম।

অনুরাগের পরিশোধন বলি কাহাকে? না অনুরাগ হইতে দ্বেষাংশের পরিমার্জ্জন—রক্ত হইতে মলাংশের পরিমার্জ্জন—অমৃত হইতে বিষাংশের পরিমার্জ্জন। ইহার উদাহরণ;—গৃহানুরাগের টান আপনার বাড়ির প্রতি সব-চেয়ে বেশী; তাহার অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি হইলে নিকট-সম্পর্কীয় জ্ঞাতিদিগের বাড়ির প্রতি বিরাগ এবং বিদ্বেষ তাহার সঙ্গের সঙ্গী হয়; এইরূপে, এ বাড়ির

প্রতি অনুরাগ এবং ও বাড়ির প্রতি বিদ্বেষ দুইই যখন মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া যায়, তখন গৃহানুরাগ হইতে সেই দ্বেষাংশের পরিমার্জ্জন অত্যাবশ্যক;—হইতে পারে তাহা কি উপায়ে? উপায় আর কিছু না—গৃহানুরাগের জানালা খুলিয়া কুলানুরাগের আলোককে ভিতরে পথ ছাড়িয়া দেওয়া! এ বাড়ি এবং ও বাড়ির মাঝ-খানে মনোমালিন্যের যত কিছু অন্ধকার—সমস্তই কুলানুরাগের আলোকে তিরোহিত হইয়া যায়; কেন না, কুলানুরাগের চক্ষে এ-বাড়িও যেমন ও-বাড়িও তেমনি। গৃহানুরাগের চুম্বক ইতিবৃত্ত এই;—প্রথমতঃ, আপনার এবং স্ত্রীপুত্র পরিবারের প্রাণানুরাগ একত্র ঘনীভূত হইয়া গৃহানুরাগের মাটি প্রস্তুত হয়; দ্বিতীয়তঃ, সেই ঘনীভূত প্রাণানুরাগ হইতে রসাকর্ষণ করিয়া গৃহানুরাগ পরিপোষিত হয়; তৃতীয়তঃ, কুলানুরাগের আলোক-প্রভাবে গৃহানুরাগ হইতে তাহার দ্বেষাংশ পরিমার্জ্জিত হইয়া গিয়া তাহার রাগাংশ প্রাচুর্ভূত হয়। তাহা যখন হয়, তখন এ-বাড়ি যেমন আপনার, ও-বাড়িও তেমনি আপনার হইয়া দাঁড়ায়। গৃহানুরাগের পৈঁটায় এ যেমন দেখা গেল—কুলানুরাগের পৈঁটাতেও তাই; আমাদের দেশে হিঁদু মুসলমানের মধ্যে যত কিছু মনোমালিন্যের জর-জ্বালা—দেশানুরাগের আলোক-রশ্মিই তাহার একমাত্র মহৌষধি। কুলানুরাগের আলোক-রশ্মিতে যেমন গৃহানুরাগের দোষ খণ্ডিয়া যায়, দেশানুরাগের আলোকরশ্মিতে তেমনি কুলানুরাগের দোষ খণ্ডিয়া যায়; এবং ঈশ্বরানুরাগের আলোক-রশ্মিতে সমস্ত অনুরাগেরই দোষ খণ্ডিয়া যায়। এক কথায়—অনুরাগ যতই উচ্চ হইতে উচ্চ পৈঁটায় পদনিক্ষেপ করে, ততই তাহার দ্বেষাংশ কমিয়া আসিতে থাকে এবং রাগাংশ বিস্তৃতি লাভ করিতে থাকে।

সংস্কৃত ভাষায় অনেকগুলি জোড়-মিলানো শব্দ আছে—তাহার মধ্যে রাগ-দ্বেষ একটি। সংসার-ক্ষেত্রে যাঁহাতক রাগ তাঁহাতক দ্বেষ; যাঁহাতক ভালবাসা, তাঁহাতক বিবাদ বিচ্ছেদ মারামারি লাঠালাঠি। আপনার প্রতি এবং আপনার আশ্রিত লোকের প্রতি যেখানেই অনুরাগের বাড়াবাড়ি, অপরাপর ব্যক্তির প্রতি সেইখানেই বিরাগের বাড়াবাড়ি; যেখানে আমি-টি এবং আমারটিই সর্ব্বস্ব, সেখানে অবশিষ্ট জগৎ শত্রুপক্ষেরই সামিল।

আমিটি এবং আমারটির আর সব ভাল কেবল টি-টাই (অর্থাৎ সংকীর্ণ ভাব-টাই) বিষের খনি। অনুরাগের নীচের নীচের পঁইটাতেই ঐ বিষদাঁতটি নিজ মূর্ত্তি ধারণ করে—উচ্চ উচ্চ পঁইটায় উহার তেজ ক্রমশই নরম পড়িয়া আসিতে থাকে; অনুরাগের সর্ব্বোচ্চ মঞ্চে ঐ বিষ-দাঁতটি একেবারেই খসিয়া পড়ে। বিষ-দাঁতের আকার প্রকার ভাবভঙ্গীতেই তাহার বিষের অনেকটা কাজ এগোয়;—গৃহানুরাগ বিষ-দাঁত বাহির করিয়া আর কিছু না বলিয়া কেবল-মাত্র যদি বলে "এরা আমার বাড়ির ছেলে মেয়ে, এদের গায়ে হাত তুলিও না" তবে তাহার অর্থই এই যে, আর-কারো বাড়ি বাড়িই নহে! কুলানুরাগ যখন বিষ-দাঁত বাহির করিয়া বলে "আমি ব্রাহ্মণ—নৈকষ্য কুলীন—অমু-কের সন্তান!" তখন তাহার অর্থই এই যে, তুমি আমার পায়ের যোগ্য নহ। দেশানুরাগ যখন বিষ-দাঁত বাহির করিয়া বলে "আমি ইংরাজ" তখন তাহার অর্থই এই যে, তুমি নিগর—তা তুমি লোহার আফ্রিকা-দেশেই থাকো আর সোণার ভারতবর্ষেই থাকো তাহাতে কিছুই আইসে যায় না; এইরূপ যেখানে যত পৃথিবীর ভালবাসা তাহারই সঙ্গে বিদ্বেষ এবং অহঙ্কারের বিষ

মিশানো রহিয়াছে ; আর, অনুরাগের সঙ্গে এইরূপ অন্ততঃ দু-ফোঁটা এক-ফোঁটা বিষ মিশানো না থাকিলে পৃথিবীর জিহ্বায় তাহা আলুনি আলুনি ঠেকে। তবে, অনুরাগ-সোপানের নীচের নীচের ধাপে বিষের যেমন সাঙ্ঘাতিক প্রকোপ—উপরের উপরের ধাপে তা-অপেক্ষা তাহা মাত্রায় অনেক কম ; তা ছাড়া, অনুরাগের সর্ব্বোচ্চ শিখরে বিষের নাম-গন্ধও থাকিতে পারে না।

যদি জিজ্ঞাসা করা যায় যে, কোন্ অনুরাগ সম্পূর্ণরূপে নির্ব্বিষ, তবে তাহার এক উত্তর এই যে, ঈশ্বরানুরাগ ; তা ভিন্ন—আর আর সমস্ত অনুরাগই জগৎ সংসারকে দুই পক্ষে বিভক্ত করে—আত্মপক্ষ এবং পরপক্ষ। কারো কাছে "আমিটি"ই কেবল আপনার—আর সকলেই পর ; কারো কাছে, আমিটি স্ত্রীটি পুত্রটি কন্যাটি ভাইটি ভগ্নিটি পর্য্যন্ত আপনার—তদ্ভিন্ন আর সকলেই পর। কারো কাছে আমিটি হইতে আপনার স্বজাতি পর্য্যন্ত আপনার তাহার ওদিকে সকলেই পর ; কারো কাছে আমি-টি হইতে স্বদেশ পর্য্যন্ত আপনার, তাহার ওদিকে সকলেই পর। এই প্রণালীতে লোকে অনুরাগ-সোপানের নীচের নীচের পঁইটা হইতে উপরের উপরের পঁইটায় পদার্পণ করিতে থাকিলে তাহার আত্ম-পক্ষ ক্রমশই বিস্তার লাভ করিতে থাকে—তাহাতে আর ভুল নাই ; কিন্তু পক্ষিশাবক যত দিন না মুক্ত আকাশে উড়িতে শেখে, ততদিন তাহার পক্ষ বিস্তারের প্রকৃত সার্থকতা হয় না ; তত দিন তাহার উত্থানের সঙ্গে পতন জোড়া লাগানো থাকে ;—লোকে যত দিন না ঈশ্বরানুরাগের মুক্ত সমীরণে উত্থান করে, তত দিন তাহার আত্মপক্ষের সঙ্গে একটা না একটা পর-পক্ষ জোড়া লাগানো থাকিতেই চায় ; ততদিন হয় এ বাড়ির

দ্বারের সম্মুখে ও বাড়ি—নয় এ জাতির দ্বারের সম্মুখে ও-জাতি, নয় এদেশের দ্বারের সম্মুখে ওদেশ, অষ্টপ্রহর চক্ষু রাঙাইয়া দাঁত মুখ খিঁচাইতে থাকে! কেবল ঈশ্বরানুরাগের পঁইটায় জগৎশুদ্ধ সকলেই আত্ম-পক্ষীয়—সেখানে পর-পক্ষের মূলেই দাঁড়াইবার স্থান নাই; ইহার কারণ এই যে, স্বদেশীয় রাজ্যের বাহিরে যেমন বিদেশীয় রাজ্য—ঈশ্বরের রাজ্যের বাহিরে তাঁহার সেরূপ কোনো প্রতিপক্ষের রাজ্য স্থান পাইতে পারে না; যেহেতু ঈশ্বর আত্মপর সমস্ত ব্যাপিয়া সমস্তেরই মূলে এবং সমস্তেরই অভ্যন্তরে অবস্থিতি করিতেছেন। এই জন্য ঈশ্বরানুরাগী ব্যক্তির একটি প্রধান পরিচয় লক্ষণ এই যে, ত্রিজগতে কেহই তাঁহার পর নহে; তাহার সাক্ষী চৈতন্য-মহাপ্রভু মুসলমানকে দলে লইতে ডরান্ নাই—রামমোহন রায় বিলাতে যাইতে ডরা'ন নাই—ঈশা জেলে মালা এবং পব্‌লিকান্ প্রভৃতি ঘৃণিত সম্প্রদায়ের সহিত মেলামেশা করিতে ডরা'ন নাই। কিন্তু হিঁদুয়ানির বড়াই যাঁহাদের ভগবদ্ভক্তির পরাকাষ্ঠা পরিচয় লক্ষণ এবং বিজাতির প্রতি বিরাগ যাঁহাদের বৈরাগ্যের চরম-সীমা—তাঁহাদের ভগবদ্ভক্তি এবং বৈরাগ্য ঐ পর্য্যন্ত। ফলে এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে, জগৎ-সংসারের মধ্য হইতে একটি কোনো ব্যক্তি অথবা একটা কোনো পরিবার বা জাতি বা দেশ বাছিয়া লইয়া তাহাতে বিশেষ রূপে আসক্ত হওয়ার নামই লোকে জানে অনুরাগ-বন্ধন; কিন্তু যে বিশ্বব্যাপী অনুরাগ কাহাকেও না বাছিয়া সকলেরই প্রতি সদ্ভাবের ক্রোড় পাতিয়া দেয়—তাহাকে চক্ষের সমক্ষে বিরাজমান দেখিলেও খুব একজন পাকা জহরী ব্যতীত যে-সে লোকে তাহাকে চিনিতে পারে না;—তাহার মুখের পানে তাকাইয়া লোকে ভাবে যে "এ

আবার কিরূপ অনুরাগ? সকলকে ছাড়িয়া একজনকে ভালবাসার নামই তো আমরা জানি ভালবাসার পরাকাষ্ঠা; সকলকে ভালবাসা আবার কিরূপ? সকলকে ভালবাসা, আর, কাহাকেও ভাল না বাসা, দুইই সমান; এ তো অনুরাগ নহে এ একপ্রকার বিরাগ; একে আমরা বৈরাগ্য বলিতে পারি—অনুরাগ কোনো মতেই বলিতে পারি না!" বাস্তবিক, এই কারণেই ঈশ্বরানুরাগের আর এক নাম হইয়াছে—বৈরাগ্য।

ঈশ্বরানুরাগ তো দূরের কথা—আমাদের দেশের প্রাচীনা গৃহ-পত্নীরা দেশানুরাগকে অনুরাগ বলিয়া কখনই স্বীকার করিবেন না; তাঁহারা অবাক্ হইয়া বলিবেন "ও মা! সোণার স্ত্রী-পুত্র নাতি নাত্নী ফেলিয়া যে-লোক যুদ্ধে যাইতে পারে—সে সবই পারে; তাহার প্রাণ পাষাণ অপেক্ষাও কঠিন—তাহার আবার অনুরাগ!" এইরূপ দেশানুরাগকেই যখন লোক-বিশেষে অনুরাগ বলিতে কুণ্ঠিত হয়, তখন ঈশ্বরানুরাগকে অনুরাগ না বলিয়া বৈরাগ্য বলিবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? আর, সাধারণ লোকের মধ্যে যে বস্তুর যে নাম রাষ্ট্র—সমজদার জহরী লোক সেই বস্তুকে সেই নামে নির্দ্দেশ করিতে অগত্যা বাধ্য হ'ন—কেননা, তাঁহারা তাহা না করিলে লোকে তাঁহাদের কথার ভাবই বুঝিতে পারিবে না।

ঈশ্বরানুরাগ কি অর্থে বৈরাগ্য এবং কি অর্থে তাহা অনুরাগের চরমসীমা তাহা এক্ষণে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইতেছে;—শুদ্ধ কেবল আমি-টি এবং আমার-টি লইয়া অনুরাগের যে-একটি সঙ্কীর্ণ গণ্ডি তাহার প্রতি বিরাগ—এই অর্থে তাহা বৈরাগ্য; আর, সমস্ত জগতের প্রতি অনুরাগ এবং আনুষঙ্গিকভাবে আমিটি-আমারটির প্রতিও অনুরাগ (কেননা আমিটি

আমারটিও জগতের এক কোণে প্রাণধারণ করিতেছে) ;—এই অর্থে তাহা অনুরাগের চরম সীমা। অন্তঃকরণে ঈশ্বরানুরাগ উদিত হইলে—সমস্ত জগতের সহিত আমি-টি এবং আমারটির সুর মিলিয়া গিয়া, তাহার ঐ বেসুরা ঝঙ্কারটি—টি-ধ্বনিটি—পাতালে বিলীন হইয়া যায়।

টি-ধ্বনিটি আর কিছু না—বিষয়াসক্তি। বিষয়-শব্দের অর্থই হ'চ্চে—মন যাহাতে ভর দিয়া শয়ন করে—মনের একপ্রকার বালিশ; সাধু-ভাষায় যাহাকে বলে উপাধি। কোনো একটি পরিমিত বিষয়ে মনের আসক্তি বসিয়া গেলে, মনকে সেখান হইতে টানিয়া তোলা দায়; কাজেই, সেই বিষয়-টির সীমার বাহিরে যাহা কিছু অবস্থিতি করে তাহার প্রতি বিরাগ তখন অবশ্যম্ভাবী। বিষয়াসক্তি এইরূপ বিরাগ-মিশ্রিত অনুরাগ; বিদ্বেষ-মিশ্রিত, অহঙ্কার-মিশ্রিত, অনুরাগ; তাই আমরা তাহার নাম দিতেছি বিষাক্ত অনুরাগ। বিষয়াসক্তির আর এক নাম কাম;—এই জন্য ঈশ্বরানুরাগকে আমরা বলি নিষ্কাম অনুরাগ; অথবা যাহা একই কথা—বিশুদ্ধ প্রেম।

অনুরাগ-সোপানের যত উচ্চে ওঠা যায়, ততই অনুরাগের বিষের ভাগ কম পড়িয়া আসে; তাহার প্রমাণ এই যে, আদুরে ছেলের মায়ের বিষ অপেক্ষা, পাড়াগেঁয়ে কুলীন-সম্প্রদায়ের বিষ মাত্রায় কম; কুলীনের কুলোপানা চক্রের ফোঁস-ফোঁসানি অপেক্ষা মানোয়ারি গোরার মুখের বিষ অনেক কম; হদ্দ ড্যাম্ নিগর-টা আস্‌টা—তার বেশী নয়! তাও আবার—অর্দ্ধেক মুখে, অর্দ্ধেক পেটে! পিতৃ-মাতৃ উচ্চারণ পূর্ব্বক পাড়া সর্‌গরম করা কুলীনসন্তানদিগেরই একচেটে পৈতৃক সম্পত্তি। এটা সত্য যে, কুলীনের মুখের অস্ফালন ফাঁকা আওয়াজ বই নয়—

গোরা-লোকের খাল্যক্রীড়া কালা-লোকের মৃত্যু! কিন্তু হইলে হইবে কি—এটাও তেমনি দেখিতেছি যে, ষাঁড়ের শৃঙ্গের আঘাতে মানুষ মারা পড়ে, কেটো পিঁপড়ের কামড়ে কাহারো বিশেষ কোনো ক্ষতি হয় না; অথচ বিষাক্ত বলিতে আমরা কেটো পিঁপড়ের কামড়কেই বিষাক্ত বলি—শৃঙ্গের আঘাতকে নহে। অধিক কি আর বলিব, দেশানুরাগের গালাগালিও দেশ-ঘটিত, কুলানুরাগের গালাগালিও কুল-ঘটিত! কুলানুরাগীর প্রধান গালাগালি হ'চ্চে বাপান্ত—দেশানুরাগীর প্রধান গালাগালি হ'চ্চে দেশান্ত—যেমন ড্যাম নিগর প্রভৃতি সাদরসম্ভাষণ! এখন জিজ্ঞাসা করি—বিষ বেশী কার? বাপান্তের না দেশান্তের? অতএব এটা স্থির যে, অনুরাগ যত উচ্চ হইতে উচ্চে পদার্পণ করে, ততই তার বিষ নরম পড়িয়া আসিতে থাকে; আর, যতই তাহা সংকীর্ণ হইতে সঙ্কীর্ণ কোটরে প্রবেশ করিতে থাকে ততই তার বিষ-দাঁত গজাইয়া উঠিতে থাকে।

নিষ্কাম কর্ম্ম আর কিছু না—নির্ব্বিষ অনুরাগ যাহার মূল প্রবর্ত্তক তাহারই নাম নিষ্কাম কর্ম্ম; আর, বিষাক্ত অনুরাগ যাহার মূল প্রবর্ত্তক তাহারই নাম সকাম কর্ম্ম। দুই ব্যক্তির মধ্যে এক ব্যক্তি যদি প্রধানতঃ আপনার উদর পূরণের জন্য কার্য্য করে, আর এক ব্যক্তি যদি প্রধানতঃ স্ত্রীপুত্র-পরিবারের ভরণ-পোষণের জন্য কার্য্য করে, তবে দ্বিতীয় ব্যক্তির কার্য্য প্রথম ব্যক্তির কার্য্য অপেক্ষা বেশী নিষ্কাম তাহাতে আর কাহারো সংশয় হইতে পারে না। অতএব ইহা অপেক্ষা স্পষ্ট আর কিছুই হইতে পারে না যে, অনুরাগ-সোপানের যিনি যত উচ্চ পৈঁটায় অবস্থিতি করেন, তাঁহার কার্য্য সেই পরিমাণে

নিষ্কাম পদবীতে সমুত্থান করে। তবেই হইতেছে যে, ঈশ্বরানুরাগ যে-কর্ম্মের মূল প্রবর্ত্তক তাহাই সম্পূর্ণরূপে নিষ্কাম শব্দের বাচ্য।

অতঃপর প্রাচ্য এবং প্রতীচ্য সাধনের মধ্যে ভেদাভেদ কিরূপ তাহা বলিবামাত্রই বুঝিতে পারা যাইবে। যথা;—

কুলানুরাগের সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে নিষ্কাম কর্ম্ম মনুষ্যের পক্ষে যতদূর সম্ভব-পর, আমাদের দেশে গৃহী ব্যক্তিদিগের সাধনার দৌড় সেই পর্য্যন্ত। আর দেশানুরাগের বিশাল পরিধির মধ্যে নিষ্কাম কর্ম্ম মনুষ্যের পক্ষে যতদূর সম্ভব-পর, প্রতীচ্য দেশে সাধনার দৌড় সেই পর্য্যন্ত। সংক্ষেপে,—প্রতীচ্য ভূখণ্ডে দেশানুরাগ, এবং প্রাচ্য ভূখণ্ডে কুলানুরাগ, হিতানুষ্ঠানের মূল প্রবর্ত্তক।

এ কথা আমি অস্বীকার করি না যে, এক্ষণে আমাদের দেশের কৃতবিদ্য লোকদিগের মনে অল্প অল্প করিয়া দেশানুরাগের অঙ্কুর গজাইতে আরম্ভ করিয়াছে এবং তাহার প্রতিদ্বন্দ্বিতা গতিকে কুলানুরাগের পরাক্রম দিন দিন খর্ব্ব হইয়া পড়িতেছে। ইহা দেখিয়া চারিদিক্ হইতে মুহুর্মুহু এইরূপ একটা ক্রন্দনের রোল উঠিতেছে যে "সব গেল, সব গেল কিছুই আর থাকে না!" কাঁদুনি-গায়কদিগের জানা উচিত যে, এক রাজার মৃত্যু হইলে আর-এক রাজা যতক্ষণ পর্য্যন্ত না সিংহাসনে উপবিষ্ট হ'ন, ততক্ষণ দেশের অরাজক অবস্থা অনিবার্য্য; কিন্তু তাহা বলিয়া কে এমন নির্ব্বোধ যে, সেই অরাজক অবস্থার প্রতিবিধান-মানসে মৃতরাজাকে চিতা হইতে উঠাইয়া আনিয়া পুনরায় তাঁহাকে ঠেকো দিয়া সিংহাসনে বসাইয়া রাখে। কুলানুরাগ এবং দেশানুরাগ দুয়ের মাঝখানে

অরাজকতার মুলুক ইহা আমরা বিলক্ষণই দেখিতেছি, কিন্তু তার সঙ্গে এটাও দেখিতেছি যে, নবাঙ্কুরিত দেশানুরাগকে দাবিয়া রাখিয়া কুলানুরাগকে সিংহাসনে বসাইতে যাওয়া বৃথা পণ্ডশ্রম। দেশানুরাগ যদি কুলানুরাগের নীচের পঁইটা হইত, তাহা হইলেই উপদেষ্টার মুখে এই কথা শোভা পাইত যে, "হে ভ্রাতৃগণ দেশানুরাগের স্কন্ধে ভর করিয়া কুলানুরাগের মঞ্চে উত্থান কর!" কিন্তু বাস্তবিক তো আর তাহা নহে—কুলানুরাগ তো দেশানুরাগের উপরের পঁইটা নহে—দেশানুরাগই কুলানুরাগের উপরের পঁইটা; কাজেই উপদেষ্টার মুখে উন্টা আরো এই কথাই শোভা পায় যে, "কুলানুরাগের স্কন্ধে ভর করিয়া দেশানুরাগের মঞ্চে উত্থান কর।"

কিন্তু আমাদের দেশে দেশানুরাগের বড়ই এক্ষণে দুর্গতি। এক্ষণে আমাদের দেশের বালকেরা বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়া অবধি পোনেরো ষোলো বৎসর ধরিয়া কুলানুরাগ ডিঙাইয়া দেশানুরাগের ইতিবৃত্ত সকল প্রবল অধ্যবসায়ের সহিত গলাধঃকরণ করিতে থাকে; অথচ দেশানুরাগ যে কি পদার্থ তাহা তাহাদের হৃদয়ে পৌঁছে না—কেবল মস্তিষ্কের মধ্যে প্রবেশ করিয়া সেখানে একটা গোলযোগ বাধাইয়া তোলে। দেশীয় দলপতিদিগের কুলানুরাগের আবরণের মধ্যে তাহারা স্বার্থের মায়াবী রাক্ষসমূর্ত্তি দেখিতে পাইয়াছে এবং ঐতিহাসিক মাহাত্মাদিগের দেশানুরাগের যশোরশ্মির অভ্যন্তরে তাহারা নিঃস্বার্থ মহত্ত্বের দেবমূর্ত্তির দর্শন পাইয়াছে—আর-এখন তাহাদিগকে ধরিয়া রাখা দায়! কিন্তু হইলে হইবে কি—দেশানুরাগের পথঘাট সমস্তই তাহাদের নিকটে অপরিচিত; কুলানুরাগের হস্তাবলম্বন ছাড়িয়া—যেমন তাহারা দেশানুরাগের পঁইটায় পা দিবার উপক্রম

করিতেছে—আর অমনি তাহাদের পা পিছলিয়া তাহারা নীচের ধাপে নামিয়া পড়িতেছে; কুলানুরাগ হইতে তাহারা উঠিবে কোথায় দেশানুরাগে—নামিয়া পড়িতেছে গৃহানুরাগে! ইহা দেখিয়া আমাদের দেশের প্রাচীন সম্প্রদায়েরা এই বলিয়া মুহুর্ম্মুহু বিলাপ করেন যে, এখনকার লোকে কেবল আপনি এবং আপনার পরিবার বোঝে।

আসল কথা এই যে, দেশানুরাগকে আমরা যে, হাত বাড়াই-লেই মুঠার মধ্যে পাইব এরূপ এক্ষণে প্রত্যাশা করাই অন্যায়। ইউরোপে কুলানুরাগের বিরুদ্ধে প্রাণপণ সংগ্রাম করিয়া তবে দেশানুরাগ জয়ী হইতে পারিয়াছে। ইউরোপের তামসিক মধ্যম অব্দে রাজ-বংশীয় লোকেরা কুলের পক্ষ হইয়া এবং অপর সাধারণ লোকেরা দেশের পক্ষ হইয়া আপনাদের মধ্যে কত না রক্তারক্তি করিয়াছে! এইরূপ অনেক বর্ষের অনেক রক্তারক্তির পর দেশানুরাগ চরমে জয় লাভ করাতে তাহারই গুণে ইউরোপ এক্ষণে ইউরোপ হইয়াছে। আমাদের দেশে ঠিক তাহার বিপরীত;—আমাদের দেশে কুলানুরাগই দেশানুরাগের উপরে জয় লাভ করিল; ব্রাহ্মণদিগের পাকচক্রে বুদ্ধের সমস্ত সংকল্প তাঁহার জন্মভূমিতে নিষ্ফল হইল; সাধারণ প্রজামণ্ডলীর উপরে কুলীন-দিগের কুলমর্য্যাদা সগর্ব্বে মস্তক উত্তোলন করিয়া দাঁড়াইল; সনাতন সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম অরণ্যে প্রস্থান করিল; এবং লোক-সমাজে কৃত্রিম কর্ম্মকাণ্ডের যজন যাজন একাধিপত্য করিতে লাগিল!

কিন্তু গতস্য শোচনা নাস্তি;—অতীতকালে যাহা ছিল তাহা ছিল—যাহা হইয়াছে তাহা হইয়াছে—তাহার জন্য ভাবিয়া কোনো ফল নাই। বর্ত্তমানকালে আমাদের আছেই বা কি আর, আমাদের করিতে হইবেই বা কি, তাহাই এক্ষণে বিবেচ্য।

আমাদের আছে যাহা, তাহা ভরপুরই আছে; নাই যাহা, তাহা মূলেই নাই; আছে কি? না কুলানুরাগ; নাই কি? না দেশানুরাগ।

এক্ষণে আমরা, করিব তবে, কি? আমরা কি দেশানুরাগের মায়া-মৃগ অনুসরণ করিয়া সারা হইব? তাহা যদি করি—তবে কুলানুরাগের সীতা হারানো এবং সেই সঙ্গে একূল ওকূল দুকূল হারানো—আমাদের ললাটে অবশ্যম্ভাবী। অকর্ম্মণ্য কুলানুরাগ যদিচ আমাদের দেশের একপ্রকার জর-বিকার, কিন্তু জর ছাড়িলেই নাড়ি ছাড়িবে—এইটি জানিয়া—বুঝিয়া সুঝিয়া ঔষধের ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। আমাদের দেশ হইতে উচ্চবংশীয় লোকের জাতীয় গৌরব সমূলে উচ্ছিন্ন হইলে—যাহা আমাদের ছিল তাহাও যাইবে, যাহা আমাদের চাই তাহাও পাইব না;—তাহা হইলে আমাদের পৌত্রানুপৌত্রেরা এই বলিয়া আমাদিগকে উপহাস করিবে যে, ছিলেন মানুষ, হইতে গেলেন দেবতা, হইয়া পড়িলেন মানুষের অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ!

তবে কি আমরা কুলানুরাগকেই সর্ব্বস্ব করিব?—তাহা যদি করি—তাহা হইলে প্রবল কাল-স্রোতের উজানে আমাদের সমাজের গতি হইবে—জ্ঞানের আলোক নিভিয়া যাইবে—মোহান্ধ কুল-গরিমা নৌকার হাল ধরিয়া মাঝি হইয়া বসিবে; সেই অন্ধ আনাড়ির হাতে আমরা যদি ধন প্রাণ সঁপিয়া দিয়া নিষ্কর্ম্মা হইয়া বসিয়া থাকি—তবে নৌকা-ডুবি অনিবার্য্য।

আমাদের দেশ এক্ষণে দ্বেষ-হিংসার তরঙ্গে দোদুল্যমান ভীষণ সমুদ্র; তাহা হইতে ভয়ে চক্ষু ফিরাইয়া কূলকেই আমরা মনে করিতেছি নিরাপদ কূল;—দূর হইতে আমাদের এইরূপ মনে হয় বটে—কিন্তু কাছে গিয়া দেখিলেই দেখিতে পাই যে,

কূল সে অতি ভয়ানক স্থান—নিবিড় অন্ধকার সেখানে নির্ভয়ে বসতি করিতেছে—তাহা ব্যাঘ্র ভল্লুক এবং সর্পের বহুকেলে আশ্রয়-দুর্গ।

বাস্তবিক, কুলানুরাগ দেশানুরাগের নীচের পঁইটা বই উপরের পঁইটা নহে।

ইউরোপীয়েরা দেশানুরাগের উত্তেজনায় কেমন অভূতপূর্ব্ব অশ্রুতপূর্ব্ব মহৎ মহৎ কার্য্য সাধন করে এবং কেমন অবলীলা-ক্রমে তাহা করে—তাহা আমরা প্রত্যহই চক্ষের সমক্ষে দেখিতেছি; কিন্তু কুলানুরাগের উত্তেজনায় আমরা কি করি? করিবার মধ্যে করি কেবল—গাঁয়ে মানে না আপনি-মণ্ডল হইয়া হিঁদুয়ানির প্রচার, অথবা যাহা একই কথা—হিঁদুয়ানির শ্রাদ্ধ! কখনো বা আমরা বন-গাঁয়ে শেয়াল রাজা হই—তখন আমাদের প্রতাপ দেখে কে?—এ'কে জাতে তুলিতেছি—ও'কে জাত হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিতেছি—এ'র নিমন্ত্রণ বন্ধ করিতেছি—ওকে সমাজে চালাইয়া লইতেছি—এইরূপ গুরুতর রাজকার্য্যের অনুষ্ঠানে ব্যাপৃত থাকিয়া (মহাবীর ডন্‌কুইক্‌সোট্‌ আমাদের কাছে কোথায় লাগে!) আমরা আপনা-আপনাকে সিংহ শার্দ্দূল অপেক্ষাও বড় মনে করিতেছি। কুলানুরাগ হইতে আমাদের দেশে কার্য্য বড় জোর এই যা সম্ভবে—এ ছাড়া আর কিছুই সম্ভবে না।

যদি বল "দেশানুরাগ!" তবে তাহার এখনো ঢের বাকি—আমাদের দেশে তাহার গোড়াপত্তনও হয় নাই। দুঃখের কথা কি বলিব—আমাদের স্বদেশানুরাগও আমাদের স্বদেশীয় সামগ্রী নহে! বিলাতি ধুতির ন্যায় আমাদের বিলাতি স্বদেশানুরাগ ইংরাজি দোকানে খুব সস্তাদরে বিক্রীত হইতেছে—টাকাটা

সিকেটা খরচ করিলেই তাহা পাওয়া যাইতে পারে;—টাকাটা সিকেটা এখানে আর কিছু না—বামণ-কায়েতের কুল-মর্য্যাদা—যাহার বিনিময়ে আমাদের দেশের আপামর সাধারণ যে-সে লোক মনে করিলেই "পেট্রিয়ট" নাম ক্রয় করিতে পারে। এরূপ দেশানুরাগ জিনিস্ খুব সস্তা বটে কিন্তু তাহার বিস্‌মোল্লায় গলদ্! বিদেশীয় ঢঙের স্বদেশানুরাগ, আর, সোণার পাথরবাটি, দুয়ের মধ্যে তিল-মাত্রও প্রভেদ নাই।

এই বিষম সংকটে আমাদের উদ্ধারের পথ একটি কেবল আছে—সেটি আমরা দেখিয়াও দেখিতেছি না; সেটি পলিসীর পথ নহে কিন্তু সত্যের পথ—ভগবদ্ভক্তি এবং বৈরাগ্যের পথ! এইস্থলে আমি বিনীতভাবে শ্রোতৃবর্গের নিকট হইতে এই একটি অনুগ্রহ ভিক্ষা চাই—যেন ভগবদ্ভক্তি বলিতে তাঁহারা কেহ প্রতিমা-পূজা অথবা মানুষ-পূজা না বোঝেন, আর, বৈরাগ্য বলিতে বনে যাওয়া অথবা কাজের বা'র হইয়া যাওয়া না বোঝেন। উপনিষদের বিশুদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞান অবলম্বন করিয়া ভগবদ্গীতার প্রণেতা যেরূপ ভগবদ্ভক্তির উপদেশ করিয়াছেন তাহাকেই এখানে আমি বলিতেছি ভগবদ্ভক্তি; আর, তিনি যেরূপ নিষ্কাম কর্ম্মের উপদেশ করিয়াছেন তাহাকেই এখানে আমি বলিতেছি বৈরাগ্য।

দেশানুরাগের কথা ছাড়িয়া দেও—তাহা আজ পর্য্যন্ত আমাদের দেশে জন্মিবারই অবকাশ পায় নাই; এক্ষণে আমাদের দেশে গৃহী ব্যক্তির যত কিছু সংসার-ধর্ম্ম, কুলানুরাগই তাহার সর্ব্বপ্রধান প্রবর্ত্তক; তা বই, বৈরাগ্য আমাদের দেশে নিষ্কাম কর্ম্মের প্রবর্ত্তক না হইয়া নিশ্চেষ্টতার প্রবর্ত্তক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বৈরাগ্যের বাগ ফিরাইয়া তাহাকে নিষ্কাম কর্ম্মের

সাধনায় নিযুক্ত করা সকল কাজের শেরা কাজ—এই কাজটি এখনো আমাদের আপনাদের হাতে রহিয়াছে।

কুলানুরাগ এ পক্ষের নির্ভরস্থল, দেশানুরাগ ও-পক্ষের নির্ভরস্থল; বৈরাগ্য অনুভয় পক্ষের নির্ভর-স্থল। বৈরাগ্যের মুক্ত সমীরণ ক্ষণকালের জন্যও যদি আমরা সেবন করি, তবে আমরা বাহিরে পরাধীন হইলেও অন্তরে স্বাধীন হই;—সে সমীরণের প্রত্যেক হিল্লোলে আমাদের ধড়ে প্রাণ আসে—তাহা মৃত-সঞ্জীবনী সুধা। সেই সুধা-সিঞ্চনে প্রাণ পাইলে মনুষ্য না করিতে পারে এমন অসাধ্য কাজই নাই। দেশানুরাগী ব্যক্তি কামান বন্দুক দিয়া বিদেশ জয় করে—এই পর্য্যন্ত;—ঈশ্বরানুরাগী ব্যক্তি হৃদয়ের অনুরাগ দিয়া পৃথিবী জয় করেন! ঈশ্বরানুরাগী ব্যক্তি যখন অনুভয় পক্ষের মুক্ত সমীরণ হইতে উভয়-পক্ষের মধ্য-স্থলে অবতীর্ণ হইয়া সকল-পক্ষেরই মঙ্গল কামনা করিয়া নিষ্কাম কর্ম্মের সাধনায় প্রবৃত্ত হ'ন, তখন কেহই তাঁহাকে বাধা দিতে পারে না। এইরূপ উচ্চ অঙ্গের নিষ্কাম-সাধনা কাহাকে বলে তাহা যদি কার্য্যে মূর্ত্তিমান্ দেখিতে চাও, তবে রামমোহন রায়ের জীবনবৃত্তান্ত পাঠ কর। উভয়-পক্ষের মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া কেমন করিয়া বিদ্বেষকে অনুরাগ-দ্বারা জয় করিতে হয়—অসত্যকে সত্য দ্বারা জয় করিতে হয়—পরকে আপনার করিতে হয়, স্বদেশীয় গুণের উচ্ছ্বাস দ্বারা বিদেশকে বশীভূত করিতে হয়—তাঁহার জীবনচরিতের প্রত্যেক পত্র এবং প্রত্যেক ছত্র তোমাকে তাহার সন্ধান বৎলিয়া দিবে। ইংলণ্ডে তাঁহার সমাধি-মন্দির দেখিয়া ভয় পাইও না; যতদিন সেখানে তিনি বাঁচিয়াছিলেন ততদিন তাঁহার মন তাঁহাকে লইয়া স্বদেশে পড়িয়া রহিয়াছিল; ততদিন—তাঁহার গাত্রে স্বদেশীয় পরিচ্ছদ

এবং কণ্ঠে স্বজাতীয় উপবীত, দুয়ে মিলিয়া সাক্ষ্য দান করিয়াছে যে, তিনি স্বদেশকেও বিস্মৃত হ'ন নাই—স্বজাতিকেও বিস্মৃত হ'ন নাই; অথচ তিনি স্বদেশ বিদেশ স্বজাতি বিজাতি সকলকে পশ্চাতে ফেলিয়া ভগবদ্ভক্তি এবং বৈরাগ্যের কৈলাশ-শিখরে দেবতাগণের সহিত একত্রে ব্রহ্মগান করিতেছিলেন; তাহার সাক্ষী—সমুদ্রের মাঝখানে "কি স্বদেশে কি বিদেশে যথায় তথায় থাকি, তোমারি রচনা মধ্যে তোমারে দেখিয়া ডাকি; দেশ-ভেদে কাল-ভেদে রচনা অসীমা, প্রতিক্ষণে সাক্ষ্যদেয় তোমার মহিমা; তোমার প্রভাব দেখি না থাকি একাকী।" এ গীত তাঁহারই হস্ত দিয়া এবং তাঁহারই কণ্ঠ দিয়া বাহির হইয়াছিল*। ব্রাহ্মণ জাতির প্রধানধর্ম্ম যে অধ্যয়ন অধ্যাপন দেবারাধনা এবং পরোপকার, তাহাই তাঁহার জীবনের একমাত্র ব্রত ছিল। তিনি এ দেশ এবং একাল দুয়ের মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া কেমন করিয়া যে

---

* যাঁহারা পালিসী-সূত্রে উপবীত ধারণ করেন তাঁহারা স্বতন্ত্র শ্রেণীর লোক: রামমোহন রায় সে দরের লোক ছিলেন না—ইহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। রামমোহন রায় অবশ্য এটা জানিতেন যে, উপবীত রাখিলেও স্বর্গ-লাভ হয় না, উপবীত ফেলিয়া দিলেও জাত যায় না। বিজ্ঞানের একটি সিদ্ধান্ত এই যে, কোনো একটি গতিশীল ব্যাপার নীচের পঁইটা ছাড়াইয়া উপরের পৈঁটায় উঠিলে নীচের পঁইটার কতক-গুলি অবয়বের ছাপ তাহার গায়ে লাগিয়া থাকে—যদিচ বর্ত্তমান পৈঁটায় তাহা আদবেই কোনো কাজে লাগে না; বিজ্ঞান-শাস্ত্রে ইহাকে বলে atavism। সর্প—টিকটিকির জাত; তাহার আদিম পূর্ব্ব পুরুষদিগের পা ছিল এরূপ অনুমান হয়; কিন্তু এখন সর্প বিনা পায়ে চলিতে পারে—সুতরাং এখন তাহার পা থাকিলেও যা, না থাকিলেও তা; না থাকিলে বরং তাহার শরীর হাল্কা হয়; কিন্তু তথাপি পূর্ব্বকালের স্মারক চিহ্ন-রূপে সর্প-শরীরের যথাস্থানে পদ-দ্বয়ের অঙ্কুর এখনো পর্য্যন্ত খোলস-ঢাকা রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। রামমোহন রায় যদিচ কুলানুরাগের পৈইটা ছাড়াইয়া অনেক উচ্চে উঠিয়াছিলেন তথাপি তাঁহার কুল-মাহাত্ম্যের একটি স্মারক-চিহ্ন তাঁহাকে দংশিয়া ধরিয়াছিল—কেবল স্বভাবের প্রভাবে; তা বই—তাহার মধ্যে কৃত্রিমতা কিছুই ছিলনা—পালিসী কিছুই ছিল না।

চকিতের মধ্যে দুই পক্ষের বিবাদ ভঞ্জন করিয়া দিলেন—দেখিয়া মনে হয় ঐন্দ্রজালিক ব্যাপার; তাহা বলিয়া তাহা কৃত্রিম পলিসীর কোনো ধার ধারে না; তাহা অকৃত্রিম অনুরাগের স্বভাব-সুলভ কার্য্য-নৈপুণ্য। তাহা প্রতিভার কন্যা—প্রত্যুৎপন্ন-মতি! দুর্বুদ্ধির কন্যা আত্মঘাতিনী পালিসী, সেই স্বর্গীয় দেব-কন্যাটির মতো সাজ-গোজ করিয়া অনভিজ্ঞ লোকের চক্ষে ধূলা দিতে পারে—কিন্তু তাহার মুখাবরণের ভিতরে একটু উঁকি দিয়া দেখিলেই দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, কৃত্রিম এবং অকৃত্রিম—দুয়ের মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ। পালিসীবেত্তারা সকলেই বুঝিতেছেন যে, হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে, খোট্টা-বাঙ্গালির মধ্যে এবং আর আর সহোদর জাতিগণের মধ্যে দলাদলির হাঙ্গামা কোনো মতে চুকিয়া যাইতে পারিলেই ভারতভূমির হাড়ে বাতাস লাগে; কিন্তু কেমন করিয়া যে, তাহা হইতে পারে তাহা কেহই বুঝিতেছেন না; একা কেবল রামমোহন রায়ই তাহা বুঝিয়াছিলেন—তিনি তাঁহার দূরদর্শী প্রজ্ঞা-নয়নে স্পষ্টা-কারে দেখিতে পাইয়াছিলেন যে, একেশ্বর-বাদের জয়-ধ্বজার অধীনেই হিন্দু মুসলমান বাঙ্গালি খোট্টা শিক প্রভৃতি ভারতবর্ষের বিভিন্ন জাতিরা এক মা-বাপের সন্তান হইয়া পুনর্জ্জন্ম লাভ করিতে পারে; মাতা—ভারতভূমি! পিতা স্বয়ম্ভু ভগবান! ইউরো-পীয় জাতিদিগের যত কিছু মহত্তর সাধনা সমস্তই প্রধানতঃ দেশানু-রাগেরই উত্তেজনা; রামমোহন রায় দেশানুরাগ হইতে আর এক ধাপ উচ্চে উঠিয়া বিশুদ্ধ ভগবদ্ভক্তি এবং নিষ্কাম সাধনার পথ আমাদিগকে প্রদর্শন করিয়া চকিতের মধ্যে অন্তর্ধান করি-লেন! তাঁহার কাজ ফুরাইল—আর তাঁহাকে কে ধরিয়া রাখিতে পারে? এমন একজন মনুষ্য সে দিন আমাদের দেশে জন্ম-

গ্রহণ করিলেন, তবুও আমরা তাঁহাকে ঘুণাক্ষরেও চিনিতে পারিলাম না—তাঁহাকে স্মরণ করিয়া এক ফোঁটাও অশ্রু বর্ষণ করিলাম না—অথচ আমরা "হায় সেকাল হায় সেকাল" করিয়া বুক চাপড়াইয়া রাস্তার মাঝখানে নূতন একতরো হাসেন হোসেন্‌কে আসরে নামাইতেছি—ইহাতে হাসিব কি কাঁদিব ঠিক্ করিয়া ওঠা দায়! হাসেন-হোসেনের নাট্যাভিনয় যথেষ্ট হইয়াছে এক্ষণে সাধনায় প্রবৃত্ত হও। রামমোহন রায় যে-পথে নিশান ধরিয়া সর্ব্বাগ্রে দাঁড়াইয়া আছেন সেই পথের অনুযাত্রী হও। ফালুতো মায়া-কান্না মায়া-ভক্তি এবং মায়া-চাতুরী ছাড়ো—পালিসী ছাড়ো! সাহসে ভর করিয়া এপক্ষ এবং ও পক্ষের মধ্যস্থলে, এদেশ এবং একালের মধ্যস্থলে, দণ্ডায়মান হও; সেই বিবাদী ভূমিতে দণ্ডায়মান হইয়া সত্য দ্বারা অসত্যকে জয় কর—অনুরাগ দ্বারা বিদ্বেষকে জয় কর—মঙ্গল দ্বারা অমঙ্গলকে জয় কর—এইরূপ কর যে, দেশের তাহাতে মঙ্গল হইবে—কুলের তাহাতে মঙ্গল হইবে— পৃথিবীর তাহাতে মঙ্গল হইবে!

শৈশব সন্ধ্যা।

দুই ধারে চষা মাটি; মাঝে আঁকাবাঁকা
চলিয়াছে পথখানি পায়ে পায়ে আঁকা
গ্রামের কিনারে; ধূ ধূ করিতেছে মাঠ
সন্ধ্যালোকে জনহীন; ভেঙ্গে গেছে হাট,
ফিরে গেছে যে যাহার ঘরে; খেয়া ঘাটে,
খেয়া নাই, বাঁধা নৌকা, মাঝি নাই পাটে।

নদীতীরে আম্রবন, তারি এক পাশে
সূর্য্য অস্ত যায়, কনক কিরণোচ্ছ্বাসে
চমক লাগায়ে দিয়ে আঁধারের চোখে।
শান্ত স্থির নদীজল, সন্ধ্যার আলোকে।
পড়ে' আছে যেন এক সোনার মুকুর।
পরপারে বালুচর বহু—বহু দূর।

শরিষার ক্ষেতভরা ফুটিয়াছে ফুল
পুকুরের এক পাড়ে; বাতাস আকুল
থেকে থেকে গন্ধ তার উড়াইয়া আনে
বহু বয়সের কথা জাগায়ে পরাণে।

কোন খানে শব্দ নাই, শুধু নদীপারে
মাঝে মাঝে ঊর্দ্ধশ্বাসে কে ডাকিছে কারে
পরপার লক্ষ্য করি,'—বালুচর ঘুরে'
স্তব্ধ নদী পার হয়ে, ম্রিয়মান সুরে
হতাশ্বাস প্রতিধ্বনি একা ফিরে আসে;
শুনি' সকরুণ ডাক পরাণ উদাসে।

ধীরে ধীরে বিস্তারিছে ঘেরি চারিধার
শ্রান্তি, আর শান্তি, আর সন্ধ্যা-অন্ধকার,
মায়ের অঞ্চলসম। দাঁড়ায়ে একাকী
মেলিয়া পশ্চিম পানে অনিমেষ আঁখি
স্তব্ধ চেয়ে আছি; আপনারে মগ্ন করি'
অতলের তলে, ধীরে লইতেছি ভরি'

জীবনের মাঝে—আজিকার এই ছবি,
জনশূন্য নদীতীর, অস্তমান রবি,
ম্লান মূর্চ্ছাতুর আলো—রোদন-অরুণ
ক্লান্ত নয়নের যেন দৃষ্টি সকরুণ
স্থির বাক্যহীন,—এই গভীর বিষাদ,
জলে স্থলে চরাচরে শ্রান্তি অবসাদ।

সহসা উঠিল গাহি' কোন্‌খান্ হতে
বন-অন্ধকার ঘন কোন্ গ্রামপথে
যেতে যেতে গৃহমুখী বালকপথিক।
উচ্ছ্বসিত কণ্ঠস্বর নিশ্চিন্ত নির্ভীক
কাঁপিছে সপ্তম সুরে; তীব্র উচ্চতান
সন্ধ্যারে কাটিয়া যেন করিবে দু'খান।

দেখিতে না পাই তারে; ওই যে সম্মুখে
প্রান্তরের সর্ব্ব প্রান্তে, দক্ষিণের মুখে,
আখের ক্ষেতের পারে, কদলি সুপারি
নিবিড় বাঁশের বন, মাঝখানে তারি
বিশ্রাম করিছে গ্রাম,—হোথা আঁখি ধায়।
হোথা কোন্ গৃহপানে গেয়ে চলে' যায়
কোন্ রাখালের ছেলে, নাহি ভাবে কিছু,
নাহি চায় শূন্যপানে, নাহি আগুপিছু।

দেখে শুনে মনে পড়ে সেই সন্ধেবেলা
শৈশবের; কত গল্প, কত বাল্যখেলা,

এক বিছানায় শুয়ে মোরা সঙ্গী তিন ;
সে কি আজিকার কথা, হল কত দিন !
এখনো কি বৃদ্ধ হয়ে যায়নি সংসার !
ভোলে নাহি খেলাধূলা, নয়নে তাহার
আসে নাই নিদ্রাবেশ শান্ত সুশীতল,
বাল্যের খেলানাগুলি করিয়া বদল
পায় নি কঠিন জ্ঞান ! দাঁড়ায়ে হেথায়

নির্জ্জন মাঠের মাঝে, নিস্তব্ধ সন্ধ্যায়,
শুনিয়া কাহার গান পড়ি' গেল মনে
কত শত নদীতীরে, কত আম্রবনে,
কাংস্যঘণ্টামুখরিত মন্দিরের ধারে,
কত শস্যক্ষেত্র প্রান্তে, পুকুরের পাড়ে
গৃহে গৃহে জাগিতেছে নব হাসিমুখ,
নবীন হৃদয়ভরা নব নব সুখ,
কত অসম্ভব কথা, অপূর্ব্ব কল্পনা,
কত অমূলক আশা, অশেষ কামনা,

অনন্ত বিশ্বাস। দাঁড়াইয়া অন্ধকারে
দেখিনু নক্ষত্রালোকে, অসীম সংসারে
রয়েছে পৃথিবী ভরি বালিকা বালক,
সন্ধ্যাশয্যা, মার মুখ, দীপের আলোক।

আকাশ-তরঙ্গ।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে আকাশতরঙ্গ ঘটিত কয়েকটি নূতন আবি-ষ্কার পাঠকের নিকট উপস্থিত করিব। বিশ বৎসর হইল

মহামতি ক্লার্ক্ ম্যাক্স্‌বেল জ্ঞানচক্ষে জড়জগতের এই অদ্ভুত রহস্য দেখিয়া যান। তিন বৎসর হইল জর্ম্মনি দেশের হার্টজ সাহেব তাহা আমাদের চর্ম্মচক্ষের গোচর করিয়াছেন। উনবিংশ শতাব্দীতে জাগতিক ক্রিয়াপ্রণালীর অনেক তথ্য বাহির হইয়াছে; কিন্তু এত বড় তথ্য বুঝি আর বাহির হয় নাই। পরিতাপ যে, মাক্সবেল আজ বাঁচিয়া নাই!

আলোক বুঝিতে গিয়া ঈথর নামক বিশ্বব্যাপী পদার্থের অস্তিত্ব প্রমাণিত হইয়াছে। আমাদের প্রাচীন পণ্ডিতের 'আকাশ' নামে একটা সূক্ষ্ম পদার্থের অস্তিত্ব কল্পনা করিয়াছিলেন; পদার্থটা তাঁহাদের মতে বিশ্বব্যাপীও ছিল। সুতরাং ঈথর শব্দের বাঙ্গলায় আমরা আকাশ বসাইতে পারি। তবে সেকালের আকাশ একটা কল্পনাপ্রসূত দ্রব্য; আর একালের আকাশের অস্তিত্বে বড় একটা সন্দেহ নাই। অন্ততঃ প্রত্যক্ষদৃষ্ট ঘর বাড়ী হাতী ঘোড়া গাছ পালা যে অর্থে অস্তি, এই আকাশ প্রত্যক্ষ না হইলেও সেই অর্থে অস্তি। নাস্তি বলিবার বড় উপায় নাই। তবে আকাশের সকল গুণাগুণ আমরা এখনও জানিতে পারি নাই; কিন্তু কোন্ পদার্থেরই বা সকল গুণাগুণ আমরা অবগত আছি?

এই আকাশের একটা গুণ এই যে,ইহা নাই এমন জায়গা নাই। শূন্য স্থলে ত আছেই তা ছাড়া জল বায়ু সোণা রূপা মাটী পাথর সকল জড় পদার্থেরই অভ্যন্তরে 'ওতপ্রোত ভাবে' জড়িত আছে। ইহার আর একটা গুণ এই যে, ইহার কোন অংশ কোন রকমে একটু নাড়িয়া দিতে পারিলে তখনি চারিদিকে ঢেউ উঠিয়া দিগন্তে বিস্তীর্ণ হয়। জল নাড়িয়া দিলে যেমন জলাশয়ের পৃষ্ঠে ঢেউ উঠিয়া প্রসারিত হয়, তার নাড়িয়া দিলে যেমন চারিদিকের

বাতাসে ঢেউ উঠিয়া প্রসারিত হয় ও শ্রুতিমধ্যে উপনীত হইলে শব্দজ্ঞান উৎপন্ন করে, তেমনি এই আকাশকে কোন রকমে নাড়িয়া দিলে ঢেউএর পর ঢেউ উঠিয়া সুদূর পর্য্যন্ত প্রসারিত হইতে থাকে। তার বেগই বা আবার কত! এখানে ঢেউ আরম্ভ হইলে সেকণ্ড মধ্যে প্রায় লক্ষ ক্রোশ দূরে যাইয়া সেই ঢেউগুলির ধাক্কা লাগিবে। সূর্য্যমণ্ডল যে এতদূরে আছে—প্রায় সাড়ে চারি কোটি ক্রোশ দূরে আছে—সেখানে সেই ঢেউ উঠিবা মাত্র আটমিনিট মধ্যে আমাদের চোখে আসিয়া তাহার ধাক্কা লাগে। চোখে আসিয়া সেই ধাক্কা লাগিয়া আমাদের মস্তিষ্ককে নাড়া দেয়; তাহাতেই আমরা জানিতে পারি যে, ওখানে একটা কি পদার্থ আছে এবং সেই পদার্থটার নাম রাখিয়া দিই সূর্য্য। ঈথর বা আকাশ আছে বলিয়াই আমরা অতবড় পদার্থের অস্তিত্বের জ্ঞান পাইতেছি।

আকাশ-সাগরের এই ঢেউগুলি বেগে বড় প্রবল, কিন্তু আকারে বড় ছোট, এক একটি ঢেউ লম্বে বড় কম। সাগরপৃষ্ঠে বাত্যাযোগে শতাধিক হাত দীর্ঘ এক এক বিশাল তরঙ্গ উঠে, পুকুরের জল নাড়িলে আধ হাত এক হাত দীর্ঘ এক একটি ঢেউ উঠিয়া থাকে; আবার অগভীর জলের উপর মৃদু বায়ু হিল্লোলে হয়ত এক আধ ইঞ্চি লম্বা, কি আরও ছোট ঢেউ উঠে। কিন্তু আকাশের যে ঢেউগুলি আমাদের আলোকজ্ঞান জন্মায়, তাহারা এক একটি এত ছোট যে, জলের ঢেউয়ের সহিত তাহার তুলনাই হয় না। তাহাদের দৈর্ঘ্য মাপিতে গেলে আর ইঞ্চিতে চলে না। ইঞ্চিকে লক্ষ ভাগ করিতে হয়। এই সকল আলোক-জনক ঢেউয়ের দৈর্ঘ্য কত, তাহা একরকম মাপিয়া ঠিক্ করা হইয়াছে। গজকাঠি দিয়া কাপড় মাপিলে তাহাতেও যেমন বড় ভুল হয়

না, এ মাপেও তেমনি বড় ভুল নাই; বরং এ মাপ তার চেয়েও সূক্ষ্ম। কারণ, ঢেউগুলি এমনি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম যে সাধারণ ইঞ্চির মাপ এখানে খাটে না—ইঞ্চির লক্ষাংশ লইয়া কারবার। ইহারই মধ্যে যে ঢেউগুলি একটু লম্বা, তাহাতেই লাল আলো দেয়; তার চেয়ে আর একটু লম্বা হইলে আর আমাদের চোখে ধরিতে পারে না। মাঝারি রকমের ঢেউগুলির মধ্যে কোনটা হল্‌দে, কোনটা সবুজ, কোনটা নীল আলো দেয়। আরও ছোট হইলে আমরা বেগুনি রঙ্‌ দেখি। তার ছোট হইলে আবার চোখে গ্রহণ করিতে পারি না।

আকাশের ঢেউ আসিয়া চোখে লাগিয়া মস্তিষ্কে নাড়া দিলে আলোর অনুভব হওয়া, আর সেই ঢেউগুলি যে অতি ক্ষুদ্র, এই ত গেল জ্যোতির্ব্বিজ্ঞানের পুরাণো কথা। এগুলি অনেকের পক্ষে নূতন নহে। কিন্তু আকাশেই যে আবার দুই হাত দশ হাত লম্বা, এমন কি দু' ক্রোশ দশ ক্রোশ লম্বা ঢেউ উঠিতে পারে, এবং সেরূপ বড় বড় ঢেউ অনবরত উঠিতেছে যাইতেছে, আমরা তাহার অস্তিত্ব ঘুণাক্ষরেও অনুভব করি না, এ কথা এ পর্য্যন্ত কোন ব্যক্তিই জানিতেন না। মাক্সবেল প্রথমে ইহার সম্ভাবনা প্রমাণ করেন, কিন্তু ইহার অস্তিত্ব আমাদের ইন্দ্রিয়-গোচর করিয়া যান নাই। সম্প্রতি হার্টজ্‌ ও তাঁহার পথবর্ত্তীদের কল্যাণে স্কুলের বালকেরা প্রকৃতির এই রহস্য-ব্যাপার উদ্ঘাটিত দেখিয়া বিস্মিত হইতেছে; এবং কয়েক বর্ষ মধ্যে হয়ত আমরা এখনকার এই বেওয়ারিষ শক্তিসমষ্টিকে আমাদের সম্পত্তিগত করিয়া সংসারকার্য্যে নিয়োজিত করিব ও তাহাতে স্বত্ব লইয়া পরস্পর ঝগড়া করিব।

রহস্যটি এই। তাড়িত শক্তি ও চৌম্বক শক্তি যে দুইটা লইয়া

আমরা আজ কাল এত কাণ্ড করিতেছি, এ দুইটা ত আলোকের মত সেই একই আকাশেরই ক্রিয়াবিশেষ মাত্র। তাড়িত শক্তির নাম করিলেই পাঠকের মনে কাচ গালা তামা দস্তা এবং টেলিগ্রাফ ও তাহার আনুষঙ্গিক দুর্ব্বোধ্য জটিল যন্ত্র পরম্পরার উদয় হয়। এ সব যেন সাধারণের আলোচ্য নহে, কোনরূপ ভেল্‌কির ব্যাপার, ইহা স্বতই মনে আসে। কিন্তু সেরূপ ভয় পাওয়ার আবশ্যক নাই। তড়িতের উদ্ভব আমরা সচরাচর দেখিতে পাই— কোন বিকট যন্ত্র বা তন্ত্রমন্ত্রের আবশ্যক করে না। সচরাচর ব্যবহৃত কালোরঙের চিরুণী লইয়া যতবার চুল আঁচড়াই, চিরুণীর গায়ে ততবারই তাড়িত ভাবের বিকাশ হয়। চুলে আঁচড় দিয়া টুক্‌রা কাগজের উপর ধরিলেই কাগজ টুক্‌রাগুলি লাফাইয়া চিরুণির গায়ে লাগিতে আসে। একটা বিড়ালের গায়ে চাপড় মারিলেই হাত তখনি তড়িৎ ধর্ম্মযুক্ত হয়। শুধু কাচ আর রেসম কেন, যে কোন দুইটি দ্রব্য গায়ে গায়ে ঘর্ষণ পাইলেই দুইটিরই গায়ে তড়িতের বিকাশ হয়—তবে দ্রব্য বিশেষে বেশী আর কম। কাজেই তড়িতের বিকাশ নিত্য ঘটনা বলিতে হইবে। আমাদের উঠিতে বসিতে কাপড় পরিতে প্রতি পদবিক্ষেপে তড়িতের সঞ্চার হইতেছে, আমরা তাহার কোন খোঁজ রাখি না। আবার চৌম্বক শক্তি বলিলেই কম্পাসের কাঁটা, ডাক্তারদের ব্যাটারি ও বড় বড় ডাইনামো মেশীন মনে পড়ে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে দ্রব্যমাত্রই ছোট বড় চুম্বক, তবে প্রবল আর দুর্ব্বল।

এই তড়িৎ ও চৌম্বকশক্তি কি, এতদিন তাহার বড় ঠিক্ ছিল না। মাক্সবেল তাহা স্থির করেন। ঈথর বা আকাশ স্থিতিস্থাপক পদার্থ; ইস্পাতের স্প্রিং বা রবরের সূতা যেমন

জিনিষ, কতকটা সেই গোছের। টানিয়া ধরিতে জোর লাগে, আবার ছাড়িয়া দিলেই পূর্ব্বের অবস্থা পায়। কিন্তু পূর্ব্বের অবস্থা একবারে পায় না। স্প্রিংটি টানিয়া ছাড়িলেই বারকত ঘন ঘন ছুলিতে থাকে, এবং ছুলিতে ছুলিতে থামিয়া যায়। অনেক জিনিষ আছে যাহা স্থিতিস্থাপক নহে; যেমন নরম মাটী, গালা, অথবা মোম। টানিলে বাড়িয়া বা বাঁকিয়া যাইবে, ছাড়িলে ছুলিবেও না, পূর্ব্বাবস্থাও পাইবে না; বাড়িয়া ও বাঁকিয়াই থাকিবে। আকাশ কতকটা স্প্রিঙের মত; কোন অংশ একটু নাড়িয়া ছাড়িলে ছুলিতে থাকে, এবং এইরূপ ছুলিতে থাকে ও স্পন্দিত হয় বলিয়াই চারিদিকে ঢেউ উঠে; সেই স্পন্দন ও আন্দোলন ক্রমশঃ সংক্রামিত ও সঞ্চালিত হইয়াই ঢেউ উৎপাদন করে। জল ও বায়ু স্থিতিস্থাপক, কাজেই তাদের এক অংশের আন্দোলনে সমস্তটা আন্দোলিত হইয়া জলে তরঙ্গ ও বায়ুতে শব্দতরঙ্গ উৎপন্ন হয়। স্থিতিস্থাপক ঈথরে যখন টান পড়ে তখনি তাড়িত শক্তির বিকাশ হয়। রবরের সূতা ছুই হাতে টানিয়া ধরিলে সেই সূতার যেমন অবস্থা হয়, কাচে রেশম ঘষিয়া কাচখানি সরাইয়া লইলে, চুলে চিরুণি ঘষিয়া চিরুণিখানি সরাইলে, উভয় দ্রব্যের মাঝে, কাচ ও রেসমের মাঝে, চুল ও চিরুণির মাঝে যে ঈথর থাকে তাহারও কতকটা সেইরূপ অবস্থা হয়। যে দ্রব্যে তাড়িত ভাবের বিকাশ দেখা যায়, তাহার পাশের ও চারিদিকের আকাশে যেন টান পড়িয়াছে। রবরের সূতা টানিয়া ধরায় ছুই হাতে যেমন পাল্‌টা টান পড়ে, এক হাত আর এক হাতের কাছে যাইতে চায়; তেমনি মাঝের ঈথরে টান পড়ায় কাগজের টুক্‌রাগুলি চিরুণির দিকে বা কাচের দিকে যাইতে চায় ও লাফাইয়া উঠে।

তবেই তড়িৎ-শক্তি কিরকম, কতকটা বুঝা গেল। দুটা জিনিষ পরস্পর ঘষিয়া যত সরাইয়া লইবে, তাহাদের মাঝের আকাশও সঙ্গে সঙ্গে টানিয়া যাইবে। হঠাৎ যদি জিনিষ দুইটা ছুঁইয়া দেওয়া যায় (একটার গায়ে আর একটা ছুঁইলে হয়, অথবা একটা তামার তার দিয়া দুটাকে স্পর্শ করিয়া দিলেও হয়,) তাহা হইলে ঈথরের টান অমনি আল্‌গা হইয়া যায়; স্প্রিংকে অথবা রবরকে টানিয়া হঠাৎ ছাড়িলে যেমন সে কয়েক-বার দুলিয়া দুলিয়া স্বাভাবিক অবস্থায় আইসে, সেইরূপ মাঝের ঈথরও বার কতক দুলিয়া আবার স্বাভাবিক অবস্থা পায়। ইহাকেই ইংরাজিতে ডিশ্‌চার্জ বলে। স্প্রিং বা রবারের সূতার যেরূপ আমাদের হস্তের অপেক্ষা অধিক জোর হইলে, নিজের দুই প্রান্ত হস্ত হইতে ছিনাইয়া লইয়া, টান আল্‌গা করিয়া লয়, তড়িৎ-শক্তিও সেইরূপ অধিক প্রবল হইলে মাঝের বাধাবিঘ্ন সকল নষ্ট করিয়া নিজের দুই প্রান্তকে একত্র করিয়া স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হয়। মাঝে বাতাস থাকিলে জ্বলিয়া উঠে, কাচ থাকিলে ভাঙ্গিয়া যায়, মানুষের শরীর থাকিলে আঘাত লাগে। বজ্রপাতের পূর্ব্বে মেঘ ও ভূপৃষ্ঠ এই দুয়ের মধ্যে সমগ্র আকাশ-টায় ঐরূপ টান পড়ে। টান অতিরিক্ত হইলেই বায়ুস্তর প্রভৃতি ব্যবধান ছিন্ন করিয়া ডিশ্‌চার্জ হয়; সমগ্র ঈথরটা কাঁপিয়া উঠে; কোন হতভাগ্য জীব সম্মুখে পড়িলে তাহার শরীরটাও ছিঁড়িয়া যায়।

তড়িতের বিকাশ যেমন আমাদের নড়িতে চড়িতেই হইতেছে, এই ডিশ্‌চার্জও সেইরূপ অলক্ষিতে নিয়তই হইতেছে। প্রতি ডিশ্‌চার্জেই খানিকটা ঈথর স্প্রিঙের মত দুলিয়া উঠে, এবং খানিকটা দুলিলেই সেই আন্দোলন চারিদিকে আকাশসাগরে

সংক্রামিত ও ব্যাপ্ত হয় তাহার আর সন্দেহ কি। সুতরাং প্রতি ডিশ্‌চার্জেই ঈথরে ঢেউ উঠিতেছে। এ ঢেউগুলি বড় ছোট নহে। ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র পরমাণু নড়িয়া ঈথরে ধাক্কা দিলে যে ছোট ছোট ঢেউ উঠিয়া আলোক উৎপাদন করে, এই সব তাড়িত ডিশ্‌চার্জের ঢেউ অবশ্য তাহার সঙ্গে তুলনীয় নহে। এই সব তরঙ্গ কেহ হাত হিসাবে কেহ বা মাইল হিসাবে দীর্ঘ, আর আলোক তরঙ্গের বেলায় বলিতে হইবে এক ইঞ্চির লক্ষ ভাগের এক ভাগ।

কথাটা এই। আকাশে ছোট বড়, অতি ছোট হইতে অতি বড় পর্য্যন্ত, ঢেউ প্রতিনিয়তই উঠিতেছে। আকাশে কোন রকমে টান বা আঘাত পড়িলেই এই সব ঢেউ উৎপন্ন হইয়া প্রবলবেগে দিগন্ত পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হয়। তপ্ত পদার্থের পরমাণু গুলির ধাক্কায় যে সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উর্ম্মি উঠে, সেইগুলি—তাহারও সব নহে, কতকগুলি মাত্র—আমাদের চক্ষুরূপ সুকৌশল যন্ত্রযোগে মস্তিষ্কে ধাক্কা দিয়া দূরস্থ পদার্থের খবর দেয়। আর বাকী সমুদয় ছোট বড় উর্ম্মি, যত মাইল দীর্ঘ হউক, আমাদের উপর দিয়া নিয়ত চলিয়া যাইলেও উপযুক্ত ইন্দ্রিয় বা যন্ত্রের অভাবে এতকাল অলক্ষিত রহিয়াছে।

মাক্সবেলই প্রথমে স্থির করেন যে, যে ঈথরে ঢেউ উঠিলে আলোক হয়, সেই ঈথরেই কোনরূপ টান পড়িলে তাড়িত ভাবের আবির্ভাব হয়; এবং ঈথর যখন এত স্প্রিঙের মত, তখন সেই তাড়িতভাব লোপের সময় অর্থাৎ ডিশ্‌চার্জের সময় বড় বড় ঢেউ উঠিবারও সম্ভাবনা। জর্ম্মণ অধ্যাপক কৌশলক্রমে তাহাদের প্রকৃত অস্তিত্ব সাধারণের প্রত্যক্ষ করিয়া আলোক ও তড়িতের সম্বন্ধ নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। এক ফুট দীর্ঘ

এক ইঞ্চি পুরু পিত্তল দণ্ডকে তড়িৎযুক্ত করিয়া, ডিশ্‌চার্জ করিলে চারিদিকের ঈথরে যে ঢেউ উঠে, তাহা প্রায় এক হাত লম্বা। কাচের বোতলের ভিতর ও বাহির পাতলা টিনের রাংতায় মুড়িয়া যে তড়িৎ-সঞ্চয়ের যন্ত্র সচরাচর প্রস্তুত হয়, ইংরাজীতে যাহাকে লীডেনজার বলে, তাহা ডিশ্‌চার্জ করিলে আরও বড় বড় ঢেউ উঠে। আমাদের চিরপরিচিত আলোকরেখা বা রশ্মিগুলি যেমন মসৃণ পদার্থের পরে পড়িয়া প্রতিফলিত হয় বা ফিরিয়া আইসে, স্বচ্ছ পদার্থে প্রবেশ করিয়া বিবর্তিত হয় বা বাঁকিয়া যায়; হার্টজের কৌশলে এই নবাবিষ্কৃত দীর্ঘ উর্ম্মির রশ্মিও সেইরূপ প্রতিফলিত ও বিবর্তিত হইয়া থাকে দেখা গিয়াছে।

হৃদয়ের

সাহিত্যের উপাদান।

সত্য অনেকে অনেক রকম করে' বোঝাতে চেষ্টা করেচেন। ন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেন যে, সত্য হচ্চে বাহ্য প্রকৃতির ত চিন্তার সামঞ্জস্য। কেউ কেউ আবার মন ছাড়া আর র অস্তিত্ব স্বীকার করতে চান না—তাঁরা বলেন, যে, সত্য পরম্পরার সুসংলগ্নতা। কিন্তু এঁরা কেবল বাহ্য মনঃপ্রকৃতির সম্বন্ধের মধ্যে যে সত্য আছে তারই আলোকে অন্ধকার দূর হয়, আগুনে হাত পোড়ে ম্বন্ধেই তাঁদের উক্তি।

সাহিত্যের সত্য বল্‌তে চাও সে একটা স। সাধারণতঃ যাকে সত্য বলা যায়, জীবনচরিতের সত্য, সে তোমার

সাহিত্যের সত্য হতে পারে না। যদি হত তবে কবিতা খুঁজে সত্যই পাওয়া যেত না, সমস্ত মিথ্যা হত। কেননা, রোমিয়ো বলে' কোন লোকই ছিল না—আর, জুলিয়েট তার প্রেমেও পড়েনি এবং বিষও পান করেনি।

তুমি বল্‌চ, লেখকের জীবনের মূলতত্ত্বই সাহিত্যের সত্য। মূল তত্ত্ব বল্‌তে তোমার ভাবটা এই—আমাদের আত্মার সহিত প্রকৃতির অথবা ঈশ্বরের সম্বন্ধ বিষয়ে একটা মতামত আমাদের মনে ক্রমশ যতই গাঢ় হতে থাকে, সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে নীতি সম্বন্ধে ভালবাসা সম্বন্ধে আমাদের মনের ভাব ততই বিজড়িত হয়ে একটা বিশেষরূপ ব্যক্তিগত আকার ধারণ পূর্ব্বক আমাদের মনে বদ্ধমূল হতে থাকে। এই একটি ভাবসমষ্টিকে জীবনের মূলতত্ত্ব বলা যায়।

তাই যদি হয় তবে দেখা আবশ্যক সেটা প্রকাশ না ক
সাহিত্য হয় কিনা।

মনে কর যে, কেউ এমন করে' বর্ণনা করতে পারত
আমরা সেই বর্ণনা পড়ে' সূর্য্যাস্তের সমস্ত সৌন্দর্য্য যেন চো
সাম্‌নে দেখ্‌তে পেতুম, তাহলে কি এই বর্ণনাকে তুমি স
ত্যের মধ্যে গণ্য করতে না? এই বর্ণনায় লেখকের জী
মূলতত্ত্ব থাকবার কোন দরকার নেই, সূর্য্যাস্তটা
মাদের মনে অঙ্কিত হওয়া নিয়ে কথা।

তুমি বল্‌চ শেক্সপিয়রের নাটকের পাত্রগণে
পিয়রের মূর্ত্তি পাবই পাব—আমরা চিন্‌তে
মনে কর যে শেক্সপিয়রের নাটকগুলো গাে
কি তার কম মূল্য হত!

তুমি বল্‌বে যে, জীবনের মূল

ওয়া যায়। আমি বলি যে, সমস্ত ভাল নাটকেই মূলতত্ত্ব
য়া যায়;—কেন না, যেখানে মানুষ আঁকা হয়েচে সেখানে
ষর জীবনের মূলতত্ত্ব খানিকটা থাক্‌বেই—তা নইলে মানু
ক ভাল রকমে আঁকা হল না। কিন্তু লেখকের জীব
মূলতত্ত্ব কি তাতে থাক্‌বেই থাক্‌বে, কিম্বা না থাক্‌লে
ত্য হবে না ?

হিত্যে মানুষকে মানুষ চেনায় বটে, কিন্তু তার
ষের কাছে চিরকাল প্রিয় সামগ্রী, এই জন্যই
য়। সাহিত্যের উদ্দে যেকালে
খে দেওয়া তখন হাতের কাছে এমন এক
র ছাড়তে পারে না। মানুষ ভাবত সামাজিক,
-প্রয়াসী, এই জন্য মা নের মত এমন
আর নেই। সাহিত্য আমাদের মনোহরণের
কম চিত্তরঞ্জক বিষয় বেছে নেয়—কিন্তু এ গুলো
মাত্র, এ তার উদ্দেশ্য নয়। যেমন ভাস্করমূর্ত্তি
পাথর খোদে, কিন্তু পাথর কাটাই যে ভাস্করের
য় না।

বিশেষে প্রকাশিত মূলতত্ত্বকে তুমি মিথ্যা
তাতে যে সৌন্দর্য্যের ছবি ধরা হয়েছে সে
র আনন্দ হয় না বরং কষ্ট হয়। সে হিসাবে
আর্টিষ্টিক্ বল্‌তে প্রস্তুত আছি। আমি টৈয়ো-
তোমার মতামত নিয়ে কিছু বল্‌চিনে—
গোটিয়ে তার নিজের মূলতত্ত্ব তার

নিয়েই যদি কথা হয় তা হলে ত গোটিয়ুকে কোন দোষ দেওয়া
যায় না।

আসল আমার বলবার উদ্দেশ্য এই যে, সাহিত্যের
অন্য সমস্ত আর্টের কার্য্য একই—কেবল উপাদা
। অনেক সময় লেখকের নিজত্ব প্রকাশ সাহিত্যের এক
উপাদান মাত্র। লেখকের নিজত্বকে ত্যাগ করে' ক
উপযোগী বিষয়কে অবলম্বন করলেও সাহিত্য সা
। অনেক বিষয় আছে যা' সাহিত্যের অনুপযো
ভাণ্ডরের অনুপযোগী। এমন
হ, এবং সে বিষয়টিকে এমন ভাবে দাঁড় করা
আমাদের আর্টিষ্টিক্ আনন্দ দিতে পারে।
আগ্রহ ভালবাসা ইত্যাদিকে যদি উপযুক্তরূপে
যায় তবে তাতে আমাদের আর্টিষ্টিক্ সুখ হয়।
তত্ত্ব, নিজের নিজত্ব, নৈতিক সত্য, দার্শনিক স
আর্টিষ্টিক্ সুখের উপাদান স্বরূপে ব্যবহৃত হতে
উদ্দেশ্য হচ্চে সেই সুখ। সকল আর্টই আমাদে
উদ্রেক করে' সুখ দেয়। সঙ্গীত একপ্রকার
আমাদের চিত্তকে বিচলিত করে, চিত্র এবং
বিশেষরূপ ভাবোদ্রেক করে। সাহিত্যের ক্ষে
চেয়ে বিস্তৃত। কারণ, সাহিত্যের অবলম্বন
মানবের সমস্ত অভিজ্ঞতার প্রসর অধিকার ক
ভাষার সাহায্যে সাহিত্য অনেক বেশি রক
বৃত্তি উদ্রেক করতে পারে—সেই

উপাদান—তখন যে সেই চিন্তা এবং ভাবা যোগে আমাদের নিজত্ব কতক পরিমাণে সাহিত্যে প্রতিফলিত হবেই তাতে আর সন্দেহ নেই। কিন্তু সাহিত্যের পক্ষে সেটা মুখ্যরূপে আবশ্যক নহে সেটা আনুষঙ্গিক মাত্র। সঙ্গীতেও রচয়িতা অথবা গায়কের আত্মস্বরূপ কিয়ৎপরিমাণে প্রকাশ পায়, চিত্র এবং মূর্ত্তিতেও তদ্রূপ। মানুষে যাই করুক না কেন তাতে তার নিজত্ব একটু থাক্‌বেই। কিন্তু আর্টের মধ্যে সেইটেকেই যে সর্ব্বময় প্রাধান্য দেওয়া আবশ্যক তা আমি মান্‌তে পারি নে।

সাময়িক সারসংগ্রহ।

সোশ্যালিজ্‌ম্।

বিলাতী খবরের কাগজে দেখা যায় য়ুরোপে সোশ্যালিষ্ট সম্প্রদায়ের উপদ্রব প্রতিদিন গুরুতর হইয়া উঠিতেছে। ইহা-দের দ্বারা সেখানে আজ হউক বা দুই দিন পরে হউক, একটা [illegible]ও সামাজিক বিপ্লব ঘটা অসম্ভব নহে। অতএব সোশ্যা-[illegible] মতটা কি তাহা আলোচনা করিয়া দেখিতে কৌতূহল জন্মে। [illegible]শ্যালিষ্ট দিগের মধ্যে যে মতের সম্পূর্ণ ঐক্য আছে [illegible] তাহাদিগের সকল মতগুলির বিস্তারিত [illegible]হ। আমরা এস্থলে কেবল বেল্‌ফর্ট্‌ [illegible] তাঁহার মত সঙ্কলন করিয়া দিতেছি। [illegible] যাঁহারা কোন কোন প্রচলিত [illegible] করিয়াছিলেন তাঁহাদিগকে ও [illegible] "লিবারাল্" কহিয়া থাকে।

এই লিবারাল্‌দিগের সহিত সোশ্যালিষ্ট্‌দিগের কোথায় প্রভেদ ব্যাক্স্‌ সাহেব তাহারই আলোচনা করিয়াছেন।

তিনি বলেন, এককালে রাজা ও প্রধানবর্গের সর্ব্বময় কর্তৃত্ব ছিল; তাহারই বিরুদ্ধে যে চেষ্টা হয় তাহাকেই "লিবারালিজ্‌ম্‌" বলা হইয়া থাকে। প্রজাদের মধ্যে প্রত্যেকেরই স্বাধীন অর্থ-সঞ্চয় এবং সম্পত্তি উপার্জ্জনের অধিকার এই চেষ্টার দ্বারা সম্পন্ন হইয়াছে। এই লিবারালদের সাহায্যে এমন সকল নিয়ম প্রচলিত হয় যাহাতে সকলের বিষয় সম্পত্তি সম্পূর্ণ সুরক্ষিত হইতে পারে।

কিন্তু এখন আবার এই স্বাধীনতা নূতন অধীনতার কারণ হইয়া উঠিয়াছে। এখন ধনের কর্তৃত্ব সর্ব্বময় হইয়া উঠিতেছে। ধনকে সুরক্ষিত করিয়া লিবারালিজ্‌ম্‌ কেবল ধনীরই সুবিধা করিতেছে; সর্ব্বসাধারণকে তাহার সম্যক্‌ সুখ ও উন্নতি হইতে বঞ্চিত করিতেছে।

সোশ্যালিজ্‌ম্‌ ধনীর কর্তৃত্বের স্থলে মানব-সাধারণের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহে।

কলের সৃষ্টি হওয়ার পর হইতে একটি নূতন বিপ্লবের স[illegible] পাত হয়। কলের দ্বারা দুইটি দলের উৎপত্তি হইয়াছে। কলওয়ালা নব্য উন্নতিশীল, আর এক, কর্ম্মচ্যুত প্রাচী[illegible] করের দল।

এক সময় ছিল, যখন কারিকরের ব[illegible] পণ্য নির্ভর করিত। তখন, তাহা[illegible] ছিল। আপনার বুদ্ধি ও কৌশলে[illegible] নিজের গুমরে থাকিতে পারিত।[illegible]

এখন কলে পণ্য উৎপন্ন [illegible]

নৈপুণ্যজাত স্বাধীনতার স্বভাবতই হ্রাস হইয়া কলওয়ালা ধন-ক্ষমতা উত্তরোত্তর বাড়িয়া উঠিয়াছে।

সোশ্যালিষ্ট্‌রা চাহে, যে, এই পণ্য উৎপাদন ও বিতরণ কোন বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তির হস্তে না থাকিয়া সাধারণ সমাজের হস্তে পড়ে। তাহারা বলে, ধন উৎপাদন এবং বণ্টন সমস্ত সমাজের কাজ। সম্প্রতি কেবল সম্পত্তিবান ব্যক্তিদের মর্জ্জি এবং স্বার্থের উপরে তাহার নির্ভর থাকাতে জন সাধারণ স্ব স্ব অবস্থার সম্পূর্ণ উন্নতির সম্ভাবনা হইতে বঞ্চিত হইতেছে।

ধনের অধীনতা সামান্য নহে। ডাকাত যদি পিস্তল দেখাইয়া বলে 'টাকা দে নয় মারিব' সেও যেমন, তেমনি কলওয়ালা মহাজন যখন বলে 'হয় এমনি করিয়া খাট্‌, নয় মর্' সেও তদ্রূপ। যে নির্দ্ধন সে একেবারে নিরুপায়। যখন ধন এবং জমী সাধারণের মধ্যে বিলি হইবে তখন এমন দৌরাত্ম্য হইতে পারিবে না।

তাহা ছাড়া কাজ এখনকার চেয়ে অনেক ভাল হইবে। দৃষ্টান্ত। মনে কর, সোশ্যালিষ্ট্‌ বিধানমতে কোন এক লোকের উপর সরকারী রুটি তৈয়ার করিবার ভার দেওয়া হইয়াছে। লোকটা রুটি যদি খারাপ করিয়া গড়ে তবে তাহার নিজের এবং সমাজের অসুখের কারণ হইবে। কাজে গোঁজামিলন দিয়া অথবা সস্তা মালমস্‌লা যোগ করিয়া তাহার কোন লাভ নাই—কারণ, সে বেতনও পায় না মূল্যও পায় না,—সমাজের আদেশমতে কাজ করে। অতএব, যখন মন্দ রুটি গড়িয়া তাহার কোন লাভ নাই এবং ভাল রুটি গড়িলে তাহার নিজের এবং সমস্ত সমাজের পরিতোষের কারণ হইবে তখন ভাল রুটি গড়া তাহার পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু বণিক মহাজনের স্বার্থই এই যত

ায় কাজ করিতে পারে—অর্থাৎ নিঃস্বার্থভাবে জিনিষটা ভাল করিবার দিকে তাহার কোন দৃষ্টি থাকে না।

অনেকে বলিয়া থাকেন ধনের সহিত স্বাধীনতার অবিচ্ছেদ্য যোগ। যাহার ধন নাই তাহাকে স্বভাবতই নানা বিষয়ে অধীনতা স্বীকার করিতে হইবে অতএব নির্দ্ধনকে স্বাধীনতা দিবার জন্য সোশ্যালিষ্টগণ যে পণ করিয়াছেন তাহা প্রকৃতিবিরুদ্ধ। গ্রন্থকর্ত্তা তদুত্তরে বলেন ধনহীন স্বাধীনতা অসম্ভব, কথাটা সত্য। সেই জন্যই ধন সাধারণের মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া বিশেষ আবশ্যক—কারণ, তাহা ব্যতীত স্বাধীনতা সর্ব্বসাধারণের মধ্যে কিছুতেই ব্যাপ্ত হইতে পারে না।

অতএব দেখা যাইতেছে সর্ব্বসাধারণের স্বাধীনতাই সোশ্যালিজ্‌মের উদ্দেশ্য। এখন, কথা উঠিতে পারে, যে, উদ্দেশ্য যাহাই হোক্ ফলে বিপরীত হইবে। কারণ, এখন স্বার্থের তাড়নায় লোকে খাটিতেছে এবং সমাজের কাজ চলিয়া যাইতেছে কিন্তু ধনের প্রলোভন চলিয়া গেলে সমাজের তাড়নায় লোককে কাজ করিতেই হইবে, সে পীড়ন কম নহে। সকলেই ইচ্ছামত আলস্যে নিযুক্ত থাকিলে কখন সমাজ টিঁকিতে পারে না, অতএব একটা কোনরূপ পীড়নের প্রথা থাকিবেই। গ্রন্থকার বলেন, একেবারে কোনরূপ পীড়ন ব্যতীত সংসার চলে না, এখনকার বিধানমতে সমাজে অন্ধ পীড়নের প্রাচুর্ভাব, কিন্তু সোশ্যালিজ্‌মের নিয়মে সমাজে যুক্তি ও বিবেচনা-সঙ্গত যথাবশ্যক সুসংযত পীড়ন প্রচলিত হইবে। এবং স্বার্থের সংশ্রব না থাকাতে সে পীড়ন ক্রমশঃ হ্রাস হইতে থাকিবে এরূপ আশা করা যায়।

ব্যাক্স্ সাহেব বলেন, আদিম কালে সাধারণের মধ্যে ধনে বিভাগ ছিল সভ্যতার প্রাচুর্ভাবে ক্রমে তাহার ব্যত্যয় হয়

ক্রমে সকলের স্ব স্ব প্রধান হইবার বাসনা জন্মে, প্রধান হইতে চেষ্টা করিলেই স্বভাবত দুই বিরোধী প্রতিদ্বন্দ্বী দলের সৃষ্টি হয়। এইরূপে সামাজিক ঐক্য নষ্ট হইয়া পার্থক্যের জন্ম হইতে থাকে। পূর্ব্বে কেবলমাত্র বহির্জাতির সহিত শত্রুতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল এখন প্রত্যেকে বড় হইতে চেষ্টা করিয়া ঘরের মধ্যে দলাদলি ঘটিতে থাকে। সভ্যতার স্বাভাবিক ফল এই। ইহার প্রধান লক্ষণ, সমাজের সহিত ব্যক্তির বিরোধ—প্রত্যেকের সমগ্রের অপেক্ষা অধিক ক্ষমতা হস্তগত করিবার চেষ্টা।

সোশ্যালিজ্‌ম সকলের মধ্যে ধনের সমবিভাগ করিয়া দিয়া পুনশ্চ সকলকে একতন্ত্রের মধ্যে বাঁধিতে চাহে এবং এই উপায়ে সকলকে যথাসম্ভব স্বাধীনতার অধিকারী করিতে চাহে, মানব-সমাজে ঐক্য এবং স্বাধীনতার সামঞ্জস্য ইহার উদ্দেশ্য।

ইংলণ্ডের আত্মানুসন্ধায়ী সভা।

প্রায় ৮। ১০ বৎসর হইল ইংলণ্ডে "আত্মানুসন্ধায়ী সভা" স্থাপিত হইয়াছে। প্রেত-দর্শন, ভবিষ্যৎ ঘটনার পূর্ব্বাভাস, সম্মোহন তত্ত্ব, (Hypnotism) দিব্যজ্ঞান (clairvoyance) প্রভৃতি আশ্চর্য্যজনক অলৌকিক কাণ্ড সকলের যথার্থ তথ্য কঠোর বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসারে নির্ণয় করা এই সভার উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত আশ্চর্য্য ঘটনা-গুলি সমিতির সভ্যেরা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান ও তাহার অকাট্য প্রমাণ গ্রহণ পূর্ব্বক বিচার করিয়া থাকেন। অনেক বিচক্ষণ বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত এই সভার সভ্য। কিছু কাল পূর্ব্বে অধ্যাপক ব্যালফোর ষ্টুয়ার্ট ইহার সভাপতি ছিলেন—

এক্ষণে পণ্ডিতবর অধ্যাপক হেন্‌রি সিজ্‌বিক ইহার সভাপতি। এই কয়েক বৎসরের মধ্যে সমিতি আত্ম-তত্ত্ব-সম্বন্ধে কিরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন জানিবার জন্য স্বভাবতই আমাদের কৌতূহল হয়। সভাপতি সিজ্‌বিক ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের ১৬ই জুলাই তারিখে উক্ত সভায় যে বক্তৃতা করেন তাহা পাঠ করিলে সভার কি উদ্দেশ্য ও সেই উদ্দেশ্য কতদূর সফল হইয়াছে তাহা আমরা অবগত হইতে পারি।

তিনি এই মর্ম্মে বলেন—"আমাদের এ কালে মানব-আত্মার প্রকৃতি ও গতি লইয়া কতই না বাদানুবাদ বিসম্বাদ চলিতেছে—পরস্পরের মধ্যে বিচ্ছেদ মনান্তর উপস্থিত হইতেছে; এই সব কষ্টকর ব্যাপার দেখিয়াই আমরা গোড়ায় এই সভা স্থাপনে প্রবৃত্ত হই। এক পক্ষে, খৃষ্টীয় শিক্ষার প্রভাবে সাধারণ সুশিক্ষিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে এই বিশ্বাসটি প্রবল যে, আমাদের আত্মা দেহ হইতে স্বতন্ত্র ও দেহের বিনাশে ইহার বিনাশ হয় না। পক্ষান্তরে আধুনিক শরীরতত্ত্ববিদ্যার সাধারণ মত উক্ত কল্পনার বিরোধী—শরীরতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা বলেন, কোন ব্যক্তির মানসিক জীবন ও ক্রিয়া-পদ্ধতি তাহার শারীরিক জীবন ও ক্রিয়া-পদ্ধতির সহিত অবিচ্ছিন্ন রূপে সংযুক্ত—দেহের বিনাশে আত্মারও বিনাশ হয়। কিন্তু আমরা কোন পক্ষেরই গোঁড়া নহি। আধুনিক বিজ্ঞান-পদ্ধতিতে আমাদের দ্বিধা-শূন্য বিশ্বাস আছে বটে; সমবেত বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতমণ্ডলীর যুক্তি-যুক্ত সিদ্ধান্ত আমরা নতশিরে গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত নহি সত্য কিন্তু তাই বলিয়া বৈজ্ঞানিকদিগের কুসংস্কার-সকল আমরা অসঙ্কোচে গ্রহণ করিতে পারি না। আমাদের বিশ্বাস, বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা বিরুদ্ধ পক্ষের প্রমাণ সকল ভাল করিয়া পরীক্ষা না করিয়াই নিজের

সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন—তাঁহাদের বিচার-পদ্ধতি এই বিষয়ে বিজ্ঞান-সিদ্ধ পদ্ধতির অনুগত নহে। আমরা এই অভাব পূরণে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলাম; আত্মার স্বতন্ত্রতা সম্বন্ধে যে সকল প্রমাণ আমাদের হস্তগত হইবে তাহা আমরা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসারে তন্ন তন্ন করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিব, ইহাই আমাদের সভার উদ্দেশ্য ছিল। এক্ষণে এই উদ্দেশ্য কতদূর সফল হইয়াছে দেখা আবশ্যক।

একটি মন অপর মনের উপর যে প্রভাব প্রকটন করে সেই প্রভাব দূর হইতে যখন অপর মনটি জানিতে পারে, তাহাকে টেলিপ্যাথি অর্থাৎ "দূরানুভূতি" বলা যায়—এই দূরানুভূতি ব্যাপারের গুরুতা আমরা পূর্ব্বেই স্বীকার করিয়াছি; এবং সম্মোহন ব্যাপারের তথ্য নির্ণয়ার্থ আমরা একটি পৃথক উপ-সমিতি স্থাপন করিয়াছি—সম্মোহিত অবস্থায় বিশেষরূপে যে দূরানুভূতিক কাণ্ড সকল প্রকাশ পায় তাহাও আমরা দেখিয়াছি। মৃত্যুকালে যে সকল উপছায়ার আবির্ভাব দেখা যায় তাহা আমরা পূর্ব্বে ভূতের গল্পশ্রেণীর মধ্যে ভুক্ত করিতাম—কিন্তু ক্রমশ আমরা জানিতে পারিয়াছি যে পীড়িতাবস্থায়, জীবনের সঙ্কটাবস্থায় কিম্বা মৃত্যুমুহূর্ত্তে আমরা যে উপছায়া দেখিতে পাই তাহাও দূরানুভূতির প্রকার-ভেদ মাত্র। আরও ইহার প্রমাণ এই পাওয়া গিয়াছে যে, আমরা মৎলব করিয়া ও ইচ্ছা করিয়াও এইরূপ উপছায়া উৎপাদন করিতে পারি—ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে। এই সকল মৃত্যু-কালীন প্রেত-দর্শন মনের বিভ্রম মাত্র—উহা বাস্তবিক বলিয়া আমাদের বিশ্বাস হয় না। যতক্ষণ না আমরা অশরীরী প্রেতাত্মার বিশিষ্ট প্রমাণ পাই ততক্ষণ আমাদের এইরূপ মনে করিতে হইবে যে শরীরী

আত্মারই কোন গুপ্ত শক্তির দ্বারা এই সকল ব্যাপার সংঘটিত হয়।”

অধ্যাপক সিজ্‌বিক ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দের ২৫ জানুয়ারি তারিখে “আত্মতত্ত্বানুসন্ধায়ী সভায়” যে বক্তৃতা করেন তাহার এক স্থলে এইরূপ বলেন—“আমাদের সভার অস্তিত্বের ৬ বৎসর কাল মধ্যে আমাদের সভার অধীন একটি উপসমিতি ১২০০ পৃষ্ঠা-ব্যাপী প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া “দূরানুভূতি” বিষয়ক মতের অনুকূলে নিজ অভিপ্রায় স্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন এবং আর একটি উপসমিতি মাদাম ব্লাভাট্‌স্কির অলৌকিক শক্তির বিরুদ্ধে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করিয়াছেন।”

অতএব দেখা যাইতেছে, “আত্মতত্ত্বানুসন্ধায়ী সভা” এখনও প্রেতাত্মার অস্তিত্বের কোন চূড়ান্ত প্রমাণ পান নাই। এই সমস্ত অলৌকিক ব্যাপার তাঁহারা একটা “দূরানুভূতি” শক্তি (telepathy) কল্পনা করিয়া ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন।

পহুঁ।

(১)

প্রাচীন বৈষ্ণব গ্রন্থ পড়িতে পড়িতে এমন সকল শব্দ পাওয়া যায় যাহাদের অর্থ করিতে যথেষ্ট পাঠ ও চিন্তার প্রয়োজন; অনেক সময় সে সকল শব্দ সংস্কৃতমূলক হইয়া থাকে, সেরকম স্থলে তাহাদের পঙ্কোদ্ধার তত দুরূহ নয়, কিন্তু যখন কোন শব্দের ধাতু অন্তর্জলীর রোগীর নাড়ীর মত খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, কিম্বা শব্দের বিভিন্ন প্রয়োগ দেখিয়া অর্থ আবিষ্কার

দুর্ঘট হইয়া পড়ে, তখন বড় বিপদ। 'নিছনি' লইয়া ইতিপূর্ব্বে আলোচনা করায়, ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের চেষ্টায় তাহার অর্থ যথেষ্ট পরিষ্কার হইয়াছে, এবং তাহাতে আমাদের আশা হইয়াছে এইরূপ আলোচনায় প্রাচীন বৈষ্ণব গ্রন্থে ব্যবহৃত অনেক দুর্ব্বোধ্য শব্দ সাধারণের বোধগম্য হইতে পারিবে।

প্রাচীন বৈষ্ণব পদাবলীতে আর একটি শব্দের খুব প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়, সে শব্দটি 'পহুঁ', কোথাও চন্দ্রবিন্দু আছে, কোথাও নাই; ইহা সংস্কৃত শব্দ, কি সংস্কৃত ধাতুমূলক বাঙ্গলা বা মৈথিলী কিম্বা অন্য কোন ভাষায় প্রচলিত গ্রাম্য শব্দ, তাহা নির্ণয় করিয়া উঠা কঠিন; বোধ হয় একের বেশী অর্থেও 'পহুঁ' ব্যবহৃত হয়; যাঁহারা এ সম্বন্ধে কিছু চিন্তা করিবেন তাঁহাদের কতকটা সুবিধা হইবে ভাবিয়া নিম্নে কয়েকটি পদাংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

একস্থানে আছে

"গোরা 'পহুঁ' বিরলে বসিয়া।

জ্ঞানদাসে আছে

"অবনত বয়নে না কহে কিছু বাণী
পরশিতে বিহসি ঠেলই 'পহুঁ' পাণি।"

অন্যত্র

"ধরি 'পহুঁ' হাসি আলিঙ্গন দেল।"

বিদ্যাপতি বলিয়াছেন

"চরকি চরকি পড়ু লোচন লোর
কত রূপে মিনতি করল 'পহুঁ' মোর।"

অনন্তদাস বলেন

"রসের আবেশে দুহুঁ হইলা বিভোর
দাস অনন্ত 'পহুঁ' না পাওল ওর।"

অন্যতম পদকর্ত্তা রসিকদাস একস্থানে বলিয়াছেন

"যৈছন চতুর শঠের 'পহুঁ'
তৈছন তাহার দূতী সে তুহুঁ।"

এইরূপে প্রায় সকল পদকর্ত্তাই 'পহুঁ' শব্দে প্রভুর ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন, একটু চিন্তা করিলেই মনে হয় 'পহুঁ' 'প্রভু' শব্দের অপভ্রংশ হইলেও হইতে পারে; এবং 'পহুঁ মোর শ্রী নিবাস' ইত্যাদি পাঠ পড়িলে সে বিষয়ে আর সন্দেহ থাকে না; উদ্ধৃত অংশগুলিতেও 'পহুঁ'র অর্থ 'প্রভু' ধরিয়া লইলে কিছু অসঙ্গত হয় না। 'পহুঁ' শব্দ ছাড়াও 'পহুঁক' কথাটি মধ্যে মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়, যথা—

"কহ রাধামোহন 'পহুঁক' বলিহারী।"

অন্যত্র

"পহুঁক প্রতাপ মন্ত্র করু যাপে।"

গোবিন্দদাস একস্থানে বলিয়াছেন

"পহুঁক চরণযুগ সারথী করবি।"

বিদ্যাপতিতেও আছে

"ধনি অলপ বয়েস বালা
জনু গাঁথনি 'পহুঁক' মালা।" *

'পহুঁক' যদি 'প্রভু' শব্দ হইতে হইয়া থাকে, তাহা হইলে 'পহুঁক' এর অর্থ 'প্রভুর' বলিলে বোধ করি অসঙ্গত হয় না।

---

* পঁহুক মালা ঠিক নহে, পহুপ মালা অর্থাৎ পুষ্পের মালা হওয়া উচিত।
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কিন্তু এ সমস্তই অনুমানের উপর বলা হইতেছে। যাহা হউক ব্যাপার এখানেই যদি শেষ হইত তাহা হইলে প্রশ্নটা জটিল হইয়া পড়িত না, কারণ তাহা হইলে 'পহুঁ'র এই একটা অর্থ ধরিয়াই চলা যাইত; কিন্তু 'পহুঁ' এরকম স্থানেও প্রয়োগ হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায় যেখানে 'পহুঁ'র অর্থ 'প্রভু' ধরিয়া লওয়া সঙ্গত বোধ হয় না; আর যদি বা টানিয়া বুনিয়া সেরূপ ভাবে ব্যবহার করা যায় তাহা হইলে পদ নিতান্ত অসম্পূর্ণ হইয়া পড়ে, নিম্নে তাহারো দু একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল, যথা

"গোবিন্দদাস 'পহুঁ' নটবর শেখর নাচত গাওত তালধারী।"

অন্যত্র

"গোবিন্দদাস 'পহুঁ' জগমনমোহন বিহরই ভেল কলপসম রাতি।"

আর একস্থানে

"রাধামোহন 'পহু' দুহু অতি নিরুপম ত্রিভুবন করু অবতংশ।"

এবং

"রাধামোহন 'পহুঁ' রসিক শুনাহ।"

নরোত্তম দাস বলিয়াছেন

"নরোত্তম দাস 'পহুঁ' নাগর কান
রসিক কলাগুরু তুহুঁ সব জান।"

বাহুল্য ভয়ে আর বেশী উদ্ধৃত করিলাম না; উদ্ধৃত পদগুলি দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে পহুঁ যদি ক্রিয়ারূপে ব্যবহার করা না যায় ত পদগুলি সম্পূর্ণ হয় না; সুতরাং 'রাধামোহন পহু রসিক শুনাহ' অর্থ রাধামোহন 'বলিতেছেন' বা 'বলেন' এবং রসিকগণ 'শুনিতেছেন' বা 'শুনেন' এরূপ বলা, কিম্বা "নরোত্তম দাস পহুঁ নাগরকান রসিক কলাগুরু তুহুঁ সব জান।" পদের অর্থ নরোত্তম দাস বলিতেছেন "হে নাগর কান তুমি রসিক

এবং কলাগুরু অতএব তুমি সকলই জান," এরূপ বলা অসঙ্গত নহে। বাস্তবিকই শেষ উদ্ধৃত পদগুলিতে 'পহুঁ'র 'বলেন' বা 'বলিতেছেন' এরূপ অর্থ না করিলে গোবিন্দদাস, রাধামোহনদাস ও নরোত্তমদাস ক্রিয়াহীন হইয়া পড়েন, কিন্তু ক্রিয়াহীন কর্ত্তার ব্যবহার কোন ক্রমেই সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না; যাহা হউক একটু আলোচনা দ্বারা বিষয়টি পরিষ্কার হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

পহুঁ।

(২)

বৈষ্ণব কবিদের গ্রন্থে সচরাচর পহুঁ শব্দের দুই অর্থ দেখা যায়, প্রভু এবং পুনঃ। শ্রদ্ধাস্পদ অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় তাঁহার প্রকাশিত প্রাচীন কাব্যসংগ্রহের টীকায় লিখিয়াছেন "পহু" অর্থে প্রভু এবং "পঁহু" অর্থে পুনঃ। কিন্তু উভয় অর্থেই পহুঁশব্দের ব্যবহার এত দেখা গিয়াছে যে নিশ্চয় বলা যায় এ নিয়ম এক্ষণে আর খাটে না।

দীনেন্দ্র বাবু যতগুলি ভণিতা উদ্ধৃত করিয়াছেন প্রায় তাহার সকলগুলিতেই পহু ও পহুঁ শব্দের অর্থ প্রভু। "গোবিন্দদাস পহুঁ নটবর শেখর" অর্থাৎ গোবিন্দদাসের প্রভু নটবর শেখর। "রাধামোহন পহুঁ রসিক সুনাহ" অর্থাৎ রাধামোহনের প্রভু রসিক সু-নাথ। "নরোত্তমদাস পহুঁ নাগর কান, রসিক কলাগুরু তুহুঁ সব জান" ইহার অর্থ এই—তুমি নরোত্তমদাসের প্রভু নাগর কান তুমি রসিক কলাগুরু তুমি সকলি জান। এরূপ ভণিতা হিন্দী গানেও দেখা যায় যথা, "তানসেনপ্রভু আকবর।"

বৈষ্ণব পদে স্থানে স্থানে সমাস ভাঙ্গাও দেখা যায়, যথা "গোবিন্দদাসের পহু হাসিয়া হাসিয়া রহু।"

কেবল একটা ভণিতায় এই অর্থ খাটে না। "রাধামোহন পহুঁ ছুঁহু অতি নিরুপম"—এস্থলে "পহুঁ"র "ভণে" অর্থ না হইলে আর কোন অর্থ পাওয়া যায় না।

আমি যতদূর আলোচনা করিয়াছি তাহাতে গোবিন্দদাস এবং তাঁহার অনুকরণকারী রাধামোহন ব্যতীত আর কোন বৈষ্ণব কবিতায় পহুঁ শব্দের এরূপ অর্থ নাই। রাধামোহনেও ভণে অর্থে "পহুঁ"র ব্যবহার অত্যন্ত বিরল—দৈবাৎ দুই একটি যদি পাওয়া যায়। "রাধামোহন পহুঁ তুয়া পায়ে নিবেদয়ে" এস্থলে পহুঁ অর্থে পুনঃ এবং অন্যত্র অধিকাংশ স্থলেই পহুঁ অর্থে প্রভু। কিন্তু গোবিন্দদাসের অনেক স্থলে "পহুঁ"র "ভণে" অর্থ ব্যবহার দেখা যায়। "গোবিন্দদাস পহুঁ দীপ সায়াহ্ন, বেলি অবসান ভৈ গেলি।" অর্থাৎ গোবিন্দদাস কহিতেছেন বেলা অবসান হইয়াছে সন্ধ্যাদীপের সময় হইল। ইহা ছাড়া এস্থলে আর কোনরূপ অর্থ কল্পনা করা যায় না। আরও এমন অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে।

এক্ষণে কথা এই, কোন্ ধাতু অনুসারে "পহুঁ"র ভণে অর্থ স্থির হইতে পারে? এক, "ভণহুঁ" * হইতে "ভহুঁ" এবং ক্রমে পহুঁ হওয়া নিতান্ত অসম্ভব নহে—কিন্তু ইহা একটা কাল্পনিক অনুমান মাত্র। বিশেষতঃ যখন গোবিন্দদাস ব্যতীত অন্য কোন প্রাচীন পদকর্ত্তার পদে পহুঁর এরূপ অর্থ দেখা যায় না তখন উক্ত অনুমানের সঙ্গত ভিত্তি নাই বলিতে হইবে।

---

* ভণহুঁ বিদ্যাপতি, শুন বর যুবতী।

আমার বিবেচনায় পূর্ব্বোক্তরূপ ভণিতার "পহুঁ" অর্থে "পুনঃ"ই ধরিয়া লইতে হইবে, এবং স্থির করিতে হইবে এরূপ ক্রিয়াহীন অসম্পূর্ণ পদবিন্যাস গোবিন্দদাসের একটি বিশেষত্ব ছিল। "গোবিন্দদাস পহুঁ" অর্থাৎ "গোবিন্দদাস পুনশ্চ বলিতেছেন" এইরূপ অর্থ করিতে হইবে। গোবিন্দদাসের স্থানে স্থানে "পহুঁ" শব্দের পরে ক্রিয়ার যোগও দেখা যায়। যথা—"গোবিন্দদাস পহুঁ এইরস গায়।" অর্থাৎ গোবিন্দদাস পুনশ্চ এই রস গান করেন।

পাঠকেরা আপত্তি করিতে পারেন এরূপ স্থলে পুনঃ অর্থের বিশেষ সার্থকতা দেখা যায় না। কিন্তু প্রাচীন কবিদিগের পদে একপ্রকার অনির্দ্দিষ্ট অর্থে পুনঃ শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। যথা—"তুহারি চরিত নাহি জানি, বিদ্যাপতি পুন শিরে কর হানি।" "রাধামোহন পুন তঁহি ভেল বঞ্চিত।" "গোবিন্দদাস কহই পুন এতিখনে না জানিয়ে কী ভেল গোরি।"

যাহা হউক, গোবিন্দদাস কখন বা ক্রিয়াপদের সহিত যোগ করিয়া কখন বা ক্রিয়াপদকে উহ্য রাখিয়া পহুঁ শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন কিন্তু সেই সেই স্থলে পহুঁ অর্থে পুনঃই বুঝিতে হইবে। অন্য কোনরূপ আনুমানিক অমূলক অর্থ কল্পনা করিয়া লওয়া সঙ্গত হয় না।

এই স্থলে প্রসঙ্গক্রমে বলিতেছি আমার কোন শ্রদ্ধেয় পূর্ব্ব-বঙ্গবাসী বন্ধুর নিকট শুনিলাম যে তাঁহাদের দেশে "নিছে-পুঁছে" শব্দের চলন আছে। এবং নব বধু ঘরে আসিলে তাহার মুখে গায়ে হাত বুলাইয়া তাহাকে "নিছিয়া" লওয়া হয়। অত-এব এরূপ চলিত প্রয়োগ থাকিলে "নিছনি" শব্দের অর্থ সম্বন্ধে সংশয় থাকে না।

সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা।

নব্যভারত। বৈশাখ। পুরাতন ও নূতন। লেখক মহাশয়ের বক্তব্য এই যে, নূতন আসে এবং পুরাতন যায়—কিন্তু হায়, বর্ত্তমান প্রবন্ধে সেই বিশ্বব্যাপী নিয়মের কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। পদের পর পদ আসিতেছে, কিন্তু পুরাতন কথাও ঘুচে না নূতন কথাও জুটে না। কোন কোন মনস্তত্ত্ববিৎ পণ্ডিত বলেন কথা ব্যতীত ভাবা অসম্ভব, সে কথা কত দূর সত্য বলিতে পারি না, কিন্তু দেখা যাইতেছে আমরা কিছু মাত্র না ভাবিয়াও অনর্গল কথা কহিয়া যাইতে পারি। অনেক স্থলে, কথা কীটের মত অতি দ্রুতবেগে আপনার বংশবৃদ্ধি করিয়া চলে, ভাবের জন্য অপেক্ষা করে না। যদি একবার দৈবাৎ কলমের মুখে বাহির হইল—"নূতনের ধারে পুরাতন থাকে না" অমনি তাহার পর আরম্ভ হইল "বৃক্ষে নূতন পত্রের উদ্গম হইলে পুরাতন পত্র খসিয়া পড়ে।" তস্য পুত্রঃ "নূতন ফুল ফুটিতেছে দেখিলে পুরাতন ফুল ঝরিয়া পড়ে।" তস্য পুত্রঃ "নবীন সূর্য্য উঠিতেছে দেখিলে চাঁদ পালায়।" তস্য পুত্রঃ "নব বসন্ত আসিতেছে দেখিলে শীত অন্তর্দ্ধান হয়।" তস্য পুত্রঃ "নূতন বন্ধুর উদয়ে পুরাতন বন্ধু লজ্জায় মুখ নত করিয়া চলিয়া যায়।" (মানবের সৌভাগ্যক্রমে পুরাতন বন্ধুর এরূপ অকারণ অতিলজ্জাশীলতা সচরাচর দেখা যায় না।) তস্য পুত্রঃ "নূতন বৎসর আসিতেছে দেখিয়া পুরাতন বৎসর থাকিবে কেন?" অবশেষে "৯৯ উদয়ে ঐ দেখ ৯৮ সাল কালের গর্ভে ডুবিয়া গিয়াছে।" এতক্ষণে কারণটা পাওয়া গেল—নববর্ষ আসিয়াছে,

অতএব সময়োচিত কতকগুলা বাক্যবিন্যাস অত্যাবশ্যক, অতএব প্রথা অনুসারে কালের গতি সম্বন্ধে উন্নতিজনক উপদেশ হতভাগ্য পাঠককে নতশিরে সহ্য করিতে হইবে। তাই, "হ্রাসবৃদ্ধি" কাহাকে বলে সেই অতি নূতন ও দুরূহ তত্বটি সম্পাদক মহাশয় দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইতে বসিয়াছেন, পাঠকেরাও অগত্যা কাঁচিয়া শিশু [illegible] বুঝিতে চেষ্টা করিতেছেন—"হ্রাস বৃদ্ধির কথাটা বলিয়া [illegible]র একটু ভাল করিয়া বলি। ছোট ছেলেটি ক্রমাগতই বড় হইতেছে! কত ভাব, কত শিক্ষা, কত রূপ, কত শোভা, কত বুদ্ধি কত প্রতিভা ক্রমে ক্রমে ফুটিতেছে। ক্রমাগত সে বাড়িতেছে। কাল সে যেরূপ ছিল, আজ আর সেরূপ নয়। বাড়িতে বাড়িতে যখন সে বার্দ্ধক্যে উপস্থিত, তখন আবার তাহার সব হ্রাস হইতে লাগিল। সৌন্দর্য্য ডুবিতেছে বুদ্ধি কমিতেছে, স্মৃতি লোপ পাইতেছে। দন্ত নড়িল, চর্ম্ম শিথিল হইল, কালো চুল পাকিল, সে ক্রমে ক্রমে আরো পুরাতন, আরো পুরাতন হইতে লাগিল। শেষে নবীনের পার্শ্বে আর দাঁড়াইতে না পারিয়া, নবীনকে সকল সম্পদ ছাড়িয়া দিয়া, লজ্জায় মুখ নত করিয়া মরণকে চুম্বন করিল। নূতন আসিল পুরাতন সরিল।"—ছোট ছেলেটি যে ক্রমে বড় হয় এবং তাহার বুদ্ধিও বাড়ে এ কথা সম্পাদক মহাশয় স্পষ্ট বুঝিয়াছেন ও বুঝাইয়াছেন—কিন্তু তাঁহার পাঠকদের সম্বন্ধে কি এ নিয়ম খাটে না? তাহারা যদি যথেষ্ট বড় হইয়া থাকে সেই সঙ্গে তাহাদের বুদ্ধি বিকাশ কি হয় নাই? এরূপ লেখা পড়িতে পড়িতে অবশেষে লেখকের অদ্ভুত সংযমশক্তি দেখিয়া আশ্চর্য্য হইতে হয়। লেখক যে বিস্তর কথা জোটাইতে পারেন ক্র[illegible] সেটা আর তেমন আশ্চর্য্য বোধ হয় না; কিন্তু অবশেষে তাঁহাকেও

যে একটা জায়গায় আসিয়া থামিতে হয় সেইটেই বিস্ময় এবং আন্তরিক কৃতজ্ঞতা উৎপাদন করে। এ কথা দুঃখের সহিত স্বীকার করিতে হইবে অবাধে বাক্য সৃষ্টি করিয়া যাওয়া এবং অবসর পাইলেই পুরাতন উপদেশের ঝুলি খুলিয়া বসা ব্রাহ্ম-দের অত্যন্ত অভ্যস্ত হইয়াছে।—মামলায় মরণ। মাম্‌লা মোকদ্দমা ম্যালেরিয়া প্রভৃতি মড়কের ন্যায় আমাদের দেশে ব্যাপ্ত হইয়া কিরূপ সর্ব্বনাশের উপক্রম করিয়াছে এই সুলিখিত প্রবন্ধটি পড়িলে হৃদয়ঙ্গম হইবে। সকল ব্যাধিই আপন অনুকূল ক্ষেত্রে অতি শীঘ্র ফলবান হইয়া উঠে—সেই কারণে কূটবুদ্ধি বাঙ্গালীর ঘরে মাম্‌লা মোকদ্দমার নিদারুণ প্রকোপ দেখা যাইতেছে। লেখক মহাশয় মাম্‌লার পরিবর্ত্তে সালিশি নিষ্পত্তির পরামর্শ দিতেছেন। কিন্তু এ পরামর্শ কাহার কর্ণগোচর হইবে? দেশে এমন কয়টা মকদ্দমা হয় যেখানে উভয় পক্ষই ন্যায্য নিষ্পত্তির প্রার্থী? অধিকাংশ স্থলেই, হয় দুই পক্ষেই নয় এক পক্ষে ফাঁকি দিতে চায়, সে অবস্থায় আদালতের মত এমন সুবিধার জায়গা কোথায় পাওয়া যাইবে? মাম্‌লা ত একপ্রকার আইনসঙ্গত জুয়াখেলা, অনেকটা দৈব এবং অনেকটা কৌশলের উপর জয় পরাজয় নির্ভর করে। সেই খেলার সর্ব্বনাশী উত্তেজনায় যাহারা সর্ব্বস্ব পর্য্যন্ত পণ করিয়া বসে তাহাদিগকে উপদেশ বাক্যে কে নিবৃত্ত করিবে? তাহারা বেশ জানে মকদ্দমার ফলাফল দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ, কিন্তু সেই তাহাদের পক্ষে প্রধান আকর্ষণ।—মুক্তিফৌজের অদ্ভুত কীর্ত্তি প্রবন্ধে জেনেরাল্ বুথ যে কিরূপ অসাধারণ উদ্যম, বুদ্ধি ও সহৃদয়তার সহিত পতিত-উদ্ধার কার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছেন তাহারই কিঞ্চিৎ আভাস দেওয়া হইয়াছে। ইহা পাঠ করিয়া আর কিছু না হউক আমাদের—বাঙ্গালীদের—অত্যগ্র

আত্মাভিমান যদি ক্ষণকালের জন্য কিঞ্চিৎ হ্রাস হয় ত সেও পরম লাভ বলিতে হইবে।

সাহিত্য। বৈশাখ। প্রভাবতী সম্ভাষণ। স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় রচিত এই প্রবন্ধটি পাঠ করিলে হৃদয় করুণা-রসে আর্দ্র না হইয়া থাকিতে পারে না। রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কন্যা প্রভাবতীকে বিদ্যাসাগর মহাশয় অপত্যনির্ব্বিশেষে ভাল বাসিতেন। তাহার অকাল মৃত্যুতে একান্ত ব্যথিত হইয়া প্রভাবতীর স্মৃতি চিরজাগরূক রাখিবার জন্য তিনি এই প্রবন্ধ রচনা করেন। ইহার একটি অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিই।—লেখক মহাশয় প্রভাবতীকে উদ্দেশ করিয়া বলিতেছেন—"আমি বাহিরের বারাণ্ডায় বসিয়া আছি; তুমি, বাড়ির ভিতরের নীচের ঘরের জানালায় দাঁড়াইয়া আমার সঙ্গে কথোপকথন করিতেছ। এমন সময়ে, শশী (রাজকৃষ্ণ বাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র) কৌতুক করিবার নিমিত্ত বলিল, "উনি আর তোমায় ভাল বাস্‌বেন না।" তুমি অমনি শিরশ্চালন পূর্ব্বক, "ভাল বস্‌বি, ভাল বস্‌বি" এই কথা আমায় বারংবার বলিতে লাগিলে। অন্যান্য দিন, আমি, ভাল বাসিব বলিয়া, অবিলম্বে তোমার শঙ্কা দূর করিতাম। সে দিন, সকলের অনুরোধে, আর ভাল বাসিব না, এই কথা বারংবার বলিতে লাগিলাম; তুমিও, প্রতিবারেই, "না ভাল বস্‌বি" এই কথা বলিতে লাগিলে। অবশেষে, আমায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ স্থির করিয়া, তুমি, স্ফূর্ত্তিহীন বদনে, "তুই ভাল বস্‌বিনি, আমি ভাল বস্‌বো" এই কথা, এরূপ মধুর স্বরভঙ্গী ও প্রভূত স্নেহরসসহকারে বলিয়া বিরত হইলে, যে তদ্দর্শনে সন্নিহিত ব্যক্তি মাত্রেরই অন্তঃকরণ অননুভূতপূর্ব্ব প্রীতিরসে পরিপূর্ণ হইল।"—

"মহারাষ্ট্রীয় ভাষার প্রাচীনত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব" প্রবন্ধটি বিশেষ অবধানযোগ্য। "নূতন বাড়ি" গল্পটি পড়িয়া আমরা সন্তোষলাভ করিতে পারিলাম না—প্রভু মহেন্দ্রনাথ বাবুকে কৌশলে আপনার সহিত বিবাহবন্ধনে বাঁধিবার জন্য বাগানের মালীর বিধবা কন্যা যে এমনতর আজগবী ফন্দি খাটায় সে আমাদের কাছে নিতান্ত সৃষ্টিছাড়া ঠেকিয়াছে।

সাধনা।

রাজার ছেলে ও রাজার মেয়ে।

(রূপকথা)

১

প্রভাতে।

রাজার ছেলে যেত পাঠশালায়,
রাজার মেয়ে যেত তথা।
দু'জনে দেখা হ'ত পথের মাঝে,
কে জানে কবেকার কথা!
রাজার মেয়ে দূরে সরে' যেত,
চুলের ফুল তার পড়ে' যেত,
রাজার ছেলে এসে তুলে' দিত
ফুলের সাথে বনলতা।
রাজার ছেলে যেত পাঠশালায়,
রাজার মেয়ে যেত তথা।
পথের দুই পাশে ফুটেছে ফুল,
পাখীরা গান গাহে গাছে।
রাজার মেয়ে আগে এগিয়ে চলে,
রাজার ছেলে যায় পাছে।

২

মধ্যাহ্নে।

উপরে বসে' পড়ে রাজার মেয়ে,
রাজার ছেলে নীচে বসে।
পুঁথি খুলিয়া শেখে কত কি ভাষা,
খড়ি পাতিয়া আঁক কষে।
রাজার মেয়ে পড়া যায় ভুলে,'
পুঁথিটি হাত হতে পড়ে খুলে,'
রাজার ছেলে এসে দেয় তুলে,'
আবার পড়ে' যায় খসে'।
উপরে বসে' পড়ে রাজার মেয়ে,
রাজার ছেলে নীচে বসে।
দুপুরে খরতাপ, বকুলশাখে
কোকিল কুহু কুহরিছে।
রাজার ছেলে চায় উপর পানে,
রাজার মেয়ে চায় নীচে।

৩

সায়াহ্নে।

রাজার ছেলে ঘরে ফিরিয়া আসে,
রাজার মেয়ে যায় ঘরে।
খুলিয়া গলা হতে মোতির মালা
রাজার মেয়ে খেলা করে।
পথে সে মালাখানি গেল ভুলে,'
রাজার ছেলে সেটি নিল তুলে'

আপন মণিহার মনোভুলে
  দিল সে বালিকার করে।
রাজার ছেলে ঘরে ফিরিয়া এল,
  রাজার মেয়ে গেল ঘরে।
শ্রান্ত রবি ধীরে অস্ত যায়
  নদীর তীরে এক শেষে।
সাঙ্গ হয়ে গেল দোঁহার পাঠ,
  যে যার গেল নিজ দেশে।—

৪

নিশীথে।

রাজার মেয়ে শোয় সোনার খাটে,
  স্বপনে দেখে রূপরাশি।
রূপোর খাটে শুয়ে রাজার ছেলে
  দেখিছে কার সুধা হাসি!
করিছে আনাগোনা সুখ দুখ,
কখনো দুরু দুরু করে বুক,
অধরে কভু কাঁপে হাসিটুকু,
  নয়ন কভু যায় ভাসি।
রাজার মেয়ে কার দেখিছে মুখ,
  রাজার ছেলে কার হাসি।
বাদর ঝর ঝর, গরজে মেঘ,
  পবন করে মাতামাতি।
শিথানে মাথা রাখি বিথান বেশ,
  স্বপনে কেটে যায় রাতি।

একটা আষাঢ়ে গল্প।

দূর সমুদ্রের মধ্যে একটি দ্বীপ। সেখানে কেবল তাসের সাহেব, তাসের বিবি, টেক্কা এবং গোলামের বাস। দুরি তিরি হইতে নহলা দহলা পর্য্যন্ত আরো অনেক ঘর গৃহস্থ আছে কিন্তু তাহারা উচ্চ জাতীয় নহে।

টেক্কা সাহেব গোলাম এই তিনটেই প্রধান বর্ণ, নহলা দহলারা অন্ত্যজ, তাহাদের সহিত এক পংক্তিতে বসিবার যোগ্য নহে।

কিন্তু চমৎকার শৃঙ্খলা। কাহার কত মূল্য এবং মর্য্যাদা তাহা বহুকাল হইতে স্থির হইয়া গেছে, তাহার রেখামাত্র ইতস্ততঃ হইবার যো নাই। সকলেই যথানির্দ্দিষ্টমতে আপন-আপন কাজ করিয়া যায়। বংশাবলিক্রমে কেবল পূর্ব্ববর্ত্তীদিগের উপর দাগা বুলাইয়া চলা।

সে যে কি কাজ তাহা বিদেশীর পক্ষে বোঝা শক্ত। হঠাৎ খেলা বলিয়া ভ্রম হয়। কেবল নিয়মে চলা ফেরা, নিয়মে যাওয়া-আসা, নিয়মে ওঠাপড়া। অদৃশ্য হস্তে তাহাদিগকে চালনা করিতেছে এবং তাহারা চলিতেছে।

তাহাদের মুখে কোন ভাবের পরিবর্ত্তন নাই। চিরকাল একমাত্র ভাব ছাপ মারা রহিয়াছে। যেন ফ্যাল্ ফ্যাল্ ছবির মত। মান্ধাতার আমল হইতে মাথার টুপি অবধি পায়ের জুতা পর্য্যন্ত অবিকল সমভাবে রহিয়াছে।

কখনো কাহাকেও চিন্তা করিতে হয় না, বিবেচনা করিতে হয় না; সকলেই মৌন নির্জ্জীবভাবে নিঃশব্দে পদচারণা করিয়া

বেড়ায় ; পতনের সময় নিঃশব্দে পড়িয়া যায় এবং অবিচলিত মুখশ্রী লইয়া চিৎ হইয়া আকাশের দিকে তাকাইয়া থাকে।

কাহারো কোন আশা নাই, অভিলাষ নাই, ভয় নাই, নূতন পথে চলিবার চেষ্টা নাই, হাসি নাই, কান্না নাই, সন্দেহ নাই, দ্বিধা নাই। খাঁচার মধ্যে যেমন পাখী ঝট্‌পট্ করে, এই চিত্রিত-বৎ মূর্ত্তিগুলির অন্তরে সেরূপ কোন একটা জীবন্ত প্রাণীর অশান্ত আক্ষেপের লক্ষণ দেখা যায় না।

অথচ এককালে এই খাঁচাগুলির মধ্যে জীবের বসতি ছিল—তখন খাঁচা দুলিত, এবং ভিতর হইতে পাখার শব্দ এবং গান শুনা যাইত। গভীর অরণ্য এবং বিস্তৃত আকাশের কথা মনে পড়িত।—এখন কেবল পিঞ্জরের সঙ্কীর্ণতা এবং সুশৃঙ্খল-শ্রেণী-বিন্যস্ত লৌহশলাকাগুলাই অনুভব করা যায়—পাখী উড়িয়াছে, কি মরিয়াছে, কি জীবন্মৃত হইয়া আছে তাহা কে বলিতে পারে!

আশ্চর্য্য স্তব্ধতা এবং শান্তি! পরিপূর্ণ স্বস্তি এবং সন্তোষ। পথে ঘাটে গৃহে সকলি সুসংযত, সুবিহিত,—শব্দ নাই, দ্বন্দ্ব নাই, উৎসাহ নাই, আগ্রহ নাই—কেবল নিত্য নৈমিত্তিক ক্ষুদ্র কাজ এবং ক্ষুদ্র বিশ্রাম।

সমুদ্র অবিশ্রাম একতান শব্দপূর্ব্বক তটের উপর সহস্র ফেন-শুভ্র কোমল করতলের আঘাত করিয়া সমস্ত দ্বীপকে নিদ্রাবেশে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে—পক্ষীমাতার দুই প্রসারিত নীলপক্ষের মত আকাশ দিক্‌দিগন্তের শান্তিরক্ষা করিতেছে। অতিদূর পরপারে গাঢ় নীল রেখার মত বিদেশের আভাস দেখা যায়—সেখান হইতে রাগদ্বেষের দ্বন্দ্বকোলাহল সমুদ্র পার হইয়া আসিতে পারে না।

২

সেই পরপারে সেই বিদেশে এক দুয়ারাণীর ছেলে এক রাজ-

পুত্র বাস করে। সে তাহার নির্ব্বাসিত মাতার সহিত সমুদ্র-তীরে আপন মনে বাল্যকাল যাপন করিতে থাকে।

সে একা বসিয়া বসিয়া মনে মনে এক অত্যন্ত বৃহৎ অভিলাষের জাল বুনিতেছে। সেই জাল দিক্‌দিগন্তরে নিক্ষেপ করিয়া কল্পনায় বিশ্বজগতের নব নব রহস্যরাশি সংগ্রহ করিয়া আপনার দ্বারের কাছে টানিয়া তুলিতেছে। তাহার অশান্ত চিত্ত সমুদ্রের তীরে, আকাশের সীমায় ঐ দিগন্তরোধী নীল গিরিমালার পরপারে সর্ব্বদা সঞ্চরণ করিয়া ফিরিতেছে—খুঁজিতে চায় কোথায় পক্ষীরাজ ঘোড়া, সাপের মাথার মাণিক, পারিজাত পুষ্প, সোনার কাঠি রূপার কাঠি পাওয়া যায়, কোথায় সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারে দুর্গম দৈত্যভবনে স্বপ্নসম্ভবা অলোকসুন্দরী রাজকুমারী ঘুমাইয়া রহিয়াছেন।

রাজপুত্র পাঠশালে পড়িতে যায়, সেখানে পাঠান্তে সদাগরের পুত্রের কাছে দেশবিদেশের কথা এবং কোটালের পুত্রের কাছে তাল বেতালের কাহিনী শোনে।

ঝুপ্ ঝুপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়ে, মেঘে অন্ধকার হইয়া থাকে,—গৃহদ্বারে মায়ের কাছে বসিয়া সমুদ্রের দিকে চাহিয়া রাজপুত্র বলে, মা, একটা খুব দূর দেশের গল্প বল। মা অনেকক্ষণ ধরিয়া তাঁহার বাল্যশ্রুত এক অপূর্ব্ব দেশের অপূর্ব্ব গল্প বলিতেন—বৃষ্টির ঝর্ ঝর্ শব্দের মধ্যে সেই গল্প শুনিয়া রাজপুত্রের হৃদয় উদাস হইয়া যাইত।

একদিন সদাগরের পুত্র আসিয়া রাজপুত্রকে কহিল—"সাঙ্গাৎ, পড়াশুনা ত সাঙ্গ করিয়াছি, এখন একবার দেশভ্রমণে বাহির হইব, তাই বিদায় লইতে আসিলাম।"

রাজপুত্র কহিল আমিও তোমার সঙ্গে যাইব। কোটালের পুত্র

কহিল আমাকে কি একা ফেলিয়া যাইবে? আমিও তোমাদের সঙ্গী।

রাজপুত্র দুঃখিনী মাকে গিয়া বলিল, মা, আমি ভ্রমণে বাহির হইতেছি—এবার তোমার দুঃখমোচনের উপায় করিয়া আসিব।

তিন বন্ধুতে বাহির হইয়া পড়িল।

৩

সমুদ্রে সদাগরের দ্বাদশতরী প্রস্তুত ছিল—তিন বন্ধু চড়িয়া বসিল। দক্ষিণের বাতাসে পাল ভরিয়া উঠিল—নৌকাগুলো রাজপুত্রের হৃদয়বাসনার মত ছুটিয়া চলিল।

শঙ্খদ্বীপে গিয়া এক নৌকা শঙ্খ, চন্দন দ্বীপে গিয়া এক নৌকা চন্দন, প্রবাল দ্বীপে গিয়া এক নৌকা প্রবাল বোঝাই হইল।

তাহার পর আর চারি বৎসরে গজদন্ত মৃগনাভি লবঙ্গ জায়ফলে যখন আর চারিটি নৌকা পূর্ণ হইল, তখন সহসা একটা বিপর্য্যয় ঝড় আসিল।

সব ক'টা নৌকা ডুবিল, কেবল একটি নৌকা তিন বন্ধুকে একটা দ্বীপে আছাড়িয়া ফেলিয়া খান্ খান্ হইয়া গেল।

এই দ্বীপে তাসের টেক্কা, তাসের সাহেব, তাসের বিবি, তাসের গোলাম যথানিয়মে বাস করে এবং দহলা নহলাগুলোও তাহাদের পদানুবর্ত্তী হইয়া যথানিয়মে কাল কাটায়।

৪

তাসের রাজ্যে এতদিন কোন উপদ্রব ছিল না, এই প্রথম গোলযোগের সূত্রপাত হইল।

এতদিন পরে এই একটা প্রথম তর্ক উঠিল—এই যে তিনটে লোক হঠাৎ একদিন সন্ধ্যাবেলায় সমুদ্র হইতে উঠিয়া আসিল ইহাদিগকে কোন্ শ্রেণীতে ফেলা যাইবে?

প্রথমতঃ ইহারা কোন্ জাতি—টেক্কা, সাহেব, গোলাম, না দহলা নহলা?

দ্বিতীয়তঃ, ইহারা কোন্ গোত্র, ইস্কাবন্, চিঁড়েতন, হরতন অথবা রুহিতন?

এ সমস্ত স্থির না হইলে ইহাদের সহিত কোনরূপ ব্যবহার করাই কঠিন। ইহারা কাহার অন্ন খাইবে, কাহার সহিত বাস করিবে, ইহাদের মধ্যে অধিকারভেদে কেই বা বায়ু কোণে, কেই বা নৈঋত কোণে, কেই বা ঈশান কোণে মাথা রাখিয়া এবং কেই বা দণ্ডায়মান হইয়া নিদ্রা দিবে তাহার কিছুই স্থির হয় না।

এ রাজ্যে এতবড় বিষম দুশ্চিন্তার কারণ ইতিপূর্ব্বে আর কখনও ঘটে নাই।

কিন্তু ক্ষুধাকাতর বিদেশী বন্ধু তিনটির এ সকল গুরুতর বিষয়ে তিলমাত্র চিন্তা নাই। তাহারা কোন গতিকে আহার পাইলে বাঁচে। যখন দেখিল তাহাদের আহারাদি দিতে সকলে ইতস্ততঃ করিতে লাগিল, এবং বিধান খুঁজিবার জন্য টেক্কারা বিরাট সভা আহ্বান করিল, তখন তাহারা যে যেখানে যে খাদ্য পাইল খাইতে আরম্ভ করিয়া দিল।

এই ব্যবহারে দুরি তিরি পর্য্যন্ত অবাক্। তিরি কহিল ভাই দুরি, ইহাদের বাচবিচার কিছুই নাই। দুরি কহিল, ভাই তিরি, বেশ দেখিতেছি ইহারা আমাদের অপেক্ষাও নীচজাতীয়।

আহারাদি করিয়া ঠাণ্ডা হইয়া তিন বন্ধু দেখিল, এখানকার মানুষগুলা কিছু নূতন রকমের। যেন জগতে ইহাদের কোথাও মূল নাই। যেন ইহাদের টিকি ধরিয়া কে উৎপাটন করিয়া লইয়াছে, ইহারা একপ্রকার হতবুদ্ধিভাবে সংসারের স্পর্শ পরিত্যাগ

করিয়া ছুলিয়া ছুলিয়া বেড়াইতেছে। যাহা কিছু করিতেছে তাহা যেন আর একজন কে করাইতেছে। ঠিক যেন পুঁৎলা বাজির দোদুল্যমান পুঁতুলগুলির মত। তাই কাহারো মুখে ভাব নাই, ভাবনা নাই, সকলেই নিরতিশয় গম্ভীর চালে যথানিয়মে চলাফেরা করিতেছে। অথচ সবসুদ্ধ ভারি অদ্ভুত দেখাইতেছে।

চারিদিকে এই জীবন্ত নির্জ্জীবতার পরম গম্ভীর রকম সকম দেখিয়া রাজপুত্র আকাশে মুখ তুলিয়া হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

এই আন্তরিক কৌতুকের উচ্চ হাস্যধ্বনি তাসরাজ্যের কলরবহীন রাজপথে ভারি বিচিত্র শুনাইল। এখানে সকলই এম্‌নি একান্ত যথাযথ, এম্‌নি পরিপাটি, এম্‌নি প্রাচীন, এম্‌নি সুগম্ভীর যে, কৌতুক আপনার অকস্মাৎ উচ্ছ্বসিত উচ্ছৃঙ্খল শব্দে আপনি চকিত হইয়া ম্লান হইয়া নির্ব্বাপিত হইয়া গেল—চারিদিকের লোকপ্রবাহ পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণ স্তব্ধ গম্ভীর অনুভূত হইল।

কোটালের পুত্র এবং সদাগরের পুত্র ব্যাকুল হইয়া রাজপুত্রকে কহিল "ভাই সাঙ্গাৎ, এই নিরানন্দ ভূমিতে আর একদণ্ড নয়! এখানে আর দুই দিন থাকিলে মাঝে মাঝে আপনাকে স্পর্শ করিয়া দেখিতে হইবে জীবিত আছি কি না।"

রাজপুত্র কহিল, "না ভাই, আমার কৌতূহল হইতেছে। ইহারা মানুষের মত দেখিতে—ইহাদের মধ্যে এক ফোঁটা জীবন্ত পদার্থ আছে কি না একবার নাড়া দিয়া দেখিতে হইবে।"

৫

এম্‌নি ত কিছু কাল যায়। কিন্তু এই তিনটে বিদেশী যুবক কোন নিয়মের মধ্যেই ধরা দেয় না। যেখানে যখন ওঠা, বসা,

মুখ ফেরানো, উপুড় হওয়া, চিৎ হওয়া, মাথা নাড়া, ডিগ্‌বাজি খাওয়া উচিত ইহারা তাহার কিছুই করে না, বরং সকৌতুকে নিরীক্ষণ করে এবং হাসে। এই সমস্ত যথাবিহিত অশেষ ক্রিয়াকলাপের মধ্যে যে একটি দিগ্‌গজ গাম্ভীর্য্য আছে ইহারা তদ্দ্বারা অভিভূত হয় না।

একদিন টেক্কা সাহেব গোলাম আসিয়া রাজপুত্র, কোটালের পুত্র এবং সদাগরের পুত্রকে হাঁড়ির মত গলা করিয়া অবিচলিত গম্ভীর মুখে জিজ্ঞাসা করিল "তোমরা বিধানমতে চলিতেছ না কেন ?"

তিন বন্ধু উত্তর করিলেন, "আমাদের ইচ্ছা।"

হাঁড়ির মত গলা করিয়া তাসরাজ্যের তিন অধিনায়ক স্বপ্নাভিভূতের মত বলিল "ইচ্ছা ! সে বেটা কে ?"

ইচ্ছা কি, সে দিন বুঝিল না কিন্তু ক্রমে ক্রমে বুঝিল। প্রতিদিন দেখিতে লাগিল, এমন করিয়া না চলিয়া অমন করিয়া চলাও সম্ভব, যেমন এদিক আছে তেমনি ওদিকও আছে, বিদেশ হইতে তিনটে জীবন্ত দৃষ্টান্ত আসিয়া জানাইয়া দিল বিধানের মধ্যেই মানবের সমস্ত স্বাধীনতার সীমা নহে। এম্‌নি করিয়া তাহারা ইচ্ছা নামক একটা রাজশক্তির প্রভাব অস্পষ্ট ভাবে অনুভব করিতে লাগিল।

ঐ সেটি যেমনি অনুভব করা অমনি তাসরাজ্যের আগাগোড়া অল্প অল্প করিয়া আন্দোলিত হইতে আরম্ভ হইল—গতনিদ্র প্রকাণ্ড অজগর সর্পের অনেকগুলা কুণ্ডলীর মধ্যে জাগরণ যেমন অত্যন্ত মন্দগতিতে সঞ্চলন করিতে থাকে সেইরূপ।

৬

নির্ব্বিকারমূর্ত্তি বিবি এতদিন কাহারো দিকে দৃষ্টিপাত করে

নাই—নির্ব্বাক্ নিরুদ্বিগ্নভাবে আপনার কাজ করিয়া গেছে। এখন একদিন বসন্তের অপরাহ্নে ইহাদের মধ্যে একজন চকিতের মধ্যে ঘনকৃষ্ণপক্ষ্ম ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত করিয়া রাজপুত্রের দিকে মুগ্ধনেত্রের কটাক্ষপাত করিল। রাজপুত্র চমকিয়া উঠিয়া কহিল, "এ কি সর্ব্বনাশ! আমি জানিতাম ইহারা এক একটা মূর্ত্তিবৎ, তাহাত নহে, দেখিতেছি এ যে নারী!"

কোটালের পুত্র ও সদাগরের পুত্রকে নিভৃতে ডাকিয়া লইয়া রাজকুমার কহিল—ভাই, ইহার মধ্যে বড় মাধুর্য্য আছে। তাহার সেই নবভাবোদ্দীপ্ত কৃষ্ণনেত্রের প্রথম কটাক্ষপাতে আমার মনে হইল যেন আমি এক নূতনসৃষ্ট জগতের প্রথম উষার প্রথম উদয় দেখিতে পাইলাম! এতদিন যে ধৈর্য্য ধরিয়া অবস্থান করিতেছি আজ তাহা সার্থক হইল।

দুই বন্ধু পরম কৌতূহলের সহিত সহাস্যে কহিল, "সত্য না কি সাঙ্গাৎ!"

সেই হতভাগিনী হরতনের বিবিটি আজ হইতে প্রতিদিন নিয়ম ভুলিতে লাগিল। তাহার যখন যেখানে হাজির হওয়া বিধান, মুহুর্মুহু তাহার ব্যতিক্রম হইতে আরম্ভ হইল। মনে কর, যখন তাহাকে গোলামের পার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইতে হইবে—তখন সে হঠাৎ রাজপুত্রের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়ায়। গোলাম অবিচলিতভাবে সুগম্ভীর কণ্ঠে বলে, বিবি তোমার ভুল হইল। শুনিয়া হরতনের বিবির স্বভাবতঃ রক্তকপোল অধিকতর রক্তবর্ণ হইয়া উঠে, তাহার নির্নিমেষ প্রশান্ত দৃষ্টি নত হইয়া যায়। রাজপুত্র উত্তর দেয়—কিছু ভুল হয় নাই; আজ হইতে আমিই গোলাম।

নবপ্রস্ফুটিত রমণীহৃদয় হইতে এ কি অভূতপূর্ব্ব শোভা,

এ কি অভাবনীয় লাবণ্য বিস্ফুরিত হইতে লাগিল! তাহার গতিতে এ কি সুমধুর চাঞ্চল্য, তাহার দৃষ্টিপাতে এ কি হৃদয়ের হিল্লোল, তাহার সমস্ত অস্তিত্ব হইতে এ কি একটি সুগন্ধি আরতি-উচ্ছ্বাস উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে!

এই নব অপরাধিনীর ভ্রম সংশোধনে সাতিশয় মনোযোগ করিতে গিয়া আজকাল সকলেরই ভ্রম হইতে লাগিল। টেক্কা আপনার চিরন্তন মর্য্যাদা রক্ষার কথা বিস্মৃত হইল, সাহেবে গোলামে আর প্রভেদ থাকে না, দহলা নহলাগুলারা পর্য্যন্ত কেমন হইয়া গেল!

এই পুরাতন দ্বীপে বসন্তের কোকিল অনেকবার ডাকিয়াছে কিন্তু সেইবার যেমন ডাকিল এমন আর কখনো ডাকে নাই। সমুদ্র চিরদিন একতান কলধ্বনিতে গান করিয়া আসিয়াছে, কিন্তু এতদিন সে সনাতন বিধানের অলঙ্ঘ্য মহিমা একসুরে ঘোষণা করিয়া আসিয়াছে, আজ সহসা দক্ষিণবায়ুচঞ্চল বিশ্বব্যাপী দুরন্ত যৌবনতরঙ্গরাশির মত আলোতে ছায়াতে ভঙ্গীতে ভাষাতে আপনার অগাধ আকুলতা ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল।

৭

এই কি সেই টেক্কা, সেই সাহেব, সেই গোলাম! কোথায় গেল সেই পরিতুষ্ট পরিপুষ্ট সুগোল মুখচ্ছবি! কেহ বা আকাশের দিকে চায়, কেহ বা সমুদ্রের ধারে বসিয়া থাকে, কাহারো বা রাত্রে নিদ্রা হয় না, কাহারো বা আহারে মন নাই।

মুখে কাহারো ঈর্ষ্যা, কাহারো অনুরাগ, কাহারো ব্যাকুলতা, কাহারো সংশয়। কোথাও হাসি, কোথাও রোদন, কোথাও সঙ্গীত। সকলেরই নিজের নিজের প্রতি এবং অন্যের প্রতি দৃষ্টি পড়িয়াছে। সকলেই আপনার সহিত অন্যের তুলনা করিতেছে।

টেক্কা ভাবিতেছে, সাহেব ছোকরাটাকে দেখিতে নেহাৎ মন্দ না হোক্ কিন্তু উহার শ্রী নাই—আমার চালচলনের মধ্যে এমন একটা মাহাত্ম্য আছে যে কোন কোন ব্যক্তিবিশেষের দৃষ্টি আমার দিকে আকৃষ্ট না হইয়া থাকিতে পারে না।

সাহেব ভাবিতেছে—টেক্কা সর্ব্বদা ভারি টক্‌টক্ করিয়া ঘাড় বাঁকাইয়া বেড়াইতেছে, মনে করিতেছে উহাকে দেখিয়া বিবিগুলা বুক ফাটিয়া মারা গেল!—বলিয়া ঈষৎ বক্র হাসিয়া দর্পণে মুখ দেখিতেছে।

দেশে যতগুলি বিবি ছিলেন সকলেই প্রাণপণে সাজসজ্জা করেন আর পরস্পরকে লক্ষ্য করিয়া বলেন "আ মরিয়া যাই! গর্ব্বিণীর এত সাজের ধূম কিসের জন্য গো বাপু! উহার রকম-সকম দেখিয়া লজ্জা করে!" বলিয়া দ্বিগুণ প্রযত্নে হাবভাব বিস্তার করিতে থাকেন।

আবার কোথাও দুই সখায় কোথাও দুই সখীতে গলা ধরিয়া নিভৃতে বসিয়া গোপন কথাবার্ত্তা হইতে থাকে। কখন হাসে, কখন কাঁদে, কখন রাগ করে, কখন মান অভিমান চলে, কখন সাধাসাধি হয়।

যুবকগুলা পথের ধারে বনের ছায়ায় তরুমূলে পৃষ্ঠ রাখিয়া শুষ্কপত্ররাশির উপর পা ছড়াইয়া অলস ভাবে বসিয়া থাকে। বালা সুনীল বসন পরিয়া সেই ছায়াপথ দিয়া আপন মনে চলিতে চলিতে সেইখানে আসিয়া মুখ নত করিয়া চোখ ফিরাইয়া লয়, যেন কাহাকেও দেখিতে পায় নাই, যেন কাহাকেও দেখা দিতে আসে নাই, এমনি ভাব করিয়া চলিয়া যায়।

তাই দেখিয়া কোন কোন ক্ষেপা যুবক দুঃসাহসে ভর করিয়া তাড়াতাড়ি কাছে অগ্রসর হয়, কিন্তু মনের মত একটাও কথা

যোগায় না, অপ্রতিভ হইয়া দাঁড়াইয়া পড়ে, অনুকূল অবসর চলিয়া যায় এবং রমণীও অতীত মুহূর্ত্তের মত ক্রমে ক্রমে দূরে বিলীন হইয়া যায়।

মাথার উপরে পাখী ডাকিতে থাকে, বাতাস অঞ্চল ও অলক উড়াইয়া হু হু করিয়া বহিয়া যায়, তরুপল্লব ঝর্ ঝর্ মর্ মর্ করে, এবং সমুদ্রের অবিশ্রাম উচ্ছ্বসিত ধ্বনি হৃদয়ের অব্যক্ত বাসনাকে দ্বিগুণ দোদুল্যমান করিয়া তোলে।

একটা বসন্তে তিনটে বিদেশী যুবক আসিয়া মরা গাঙ্গে এমনি একটা ভরা তুফান তুলিয়া দিল।

৮

রাজপুত্র দেখিলেন জোয়ার ভাঁটার মাঝখানে সমস্ত দেশটা থম্ থম্ করিতেছে—কথা নাই কেবল মুখ চাওয়াচাওয়ি, কেবল এক পা এগোনো দুই পা পিছোনো, কেবল আপনার মনের বাসনা স্তূপাকার করিয়া বালির ঘর গড়া এবং বালির ঘর ভাঙ্গা। সকলেই যেন ঘরের কোণে বসিয়া আপনার অগ্নিতে আপনাকে আহুতি দিতেছে, এবং প্রতিদিন কৃশ ও বাক্যহীন হইয়া যাইতেছে। কেবল চোখ দুটা জলিতেছে এবং অন্তর্নিহিত বাণীর আন্দোলনে ওষ্ঠাধর বায়ুকম্পিত পল্লবের মত স্পন্দিত হইতেছে।

রাজপুত্র সকলকে ডাকিয়া বলিলেন—বাঁশি আন, তুরি ভেরি বাজাও, সকলে আনন্দধ্বনি কর, হরতনের বিবি স্বয়ম্বরা হইবেন।

তৎক্ষণাৎ দহলা নহলা বাঁশিতে ফুঁ দিতে লাগিল, দুরি তিরি তুরি-ভেরি লইয়া পড়িল। হঠাৎ এই তুমুল আনন্দতরঙ্গে সেই কানাকানি চাওয়াচাওয়ি ভাঙ্গিয়া গেল।

উৎসবে নরনারী একত্র মিলিত হইয়া কত কথা, কত হাসি, কত পরিহাস! কত রহস্যচ্ছলে মনের কথা বলা, কত ছল করিয়া অবিশ্বাস দেখানো, কত উচ্চ হাস্যে তুচ্ছ আলাপ। ঘন অরণ্যে বাতাস উঠিলে যেমন শাখায় শাখায় পাতায় পাতায় লতায় বৃক্ষে নানা ভঙ্গিতে হেলাদোলা মেলামেলি হইতে থাকে ইহাদের মধ্যে তেম্‌নি হইতে লাগিল।

এম্‌নি কলরব আনন্দোৎসবের মধ্যে বাঁশিতে সকাল হইতে বড় মধুরস্বরে সাহানা বাজিতে লাগিল। আনন্দের মধ্যে গভীরতা, মিলনের মধ্যে ব্যাকুলতা, বিশ্বদৃশ্যের মধ্যে সৌন্দর্য্য, এবং হৃদয়ে হৃদয়ে প্রীতির বেদনা সঞ্চার করিতে লাগিল। যাহারা ভাল করিয়া ভালবাসে নাই তাহারা ভালবাসিল, যাহারা ভালবাসিয়াছিল তাহারা আনন্দে উদাস হইয়া গেল।

হরতনের বিবি রাঙা বসন পরিয়া সমস্ত দিন একটা গোপন ছায়াকুঞ্জে বসিয়াছিল। তাহার কানেও দূর হইতে সাহানার তান প্রবেশ করিতেছিল এবং তাহার দুটি চক্ষু মুদিত হইয়া আসিয়াছিল—হঠাৎ এক সময়ে চক্ষু মেলিয়া দেখিল, সম্মুখে রাজপুত্র বসিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া আছে; সে অমনি কম্পিতদেহে দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া ভূমিতে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িল।

রাজপুত্র সমস্ত দিন একাকী সমুদ্রতীরে পদচারণা করিতে করিতে সেই সন্ত্রস্ত নেত্রক্ষেপ এবং সলজ্জ লুণ্ঠন মনে মনে আলোচনা করিতে লাগিলেন।

৯

রাত্রে শত সহস্র দীপের আলোকে, মালার সুগন্ধে, বাঁশির সঙ্গীতে, অলঙ্কৃত সুসজ্জিত সহাস্য শ্রেণীবদ্ধ যুবকদের সভায়

একটি বালিকা ধীরে ধীরে কম্পিতচরণে মালা হাতে করিয়া রাজপুত্রের সম্মুখে আসিয়া নতশিরে দাঁড়াইল। অভিলষিত কণ্ঠে মালাও উঠিল না, অভিলষিত মুখে চোখও তুলিতে পারিল না। রাজপুত্র তখন আপনি শির নত করিলেন এবং মাল্য স্খলিত হইয়া তাঁহার কণ্ঠে পড়িয়া গেল। চিত্রবৎ নিস্তব্ধ সভা সহসা আনন্দ-উচ্ছ্বাসে আলোড়িত হইয়া উঠিল।

সকলে বরকন্যাকে সমাদর করিয়া সিংহাসনে লইয়া বসাইল। রাজপুত্রকে সকলে মিলিয়া রাজ্যে অভিষেক করিল।

১০

সমুদ্রপারের দুঃখিনী দুয়ারাণী সোনার তরীতে চড়িয়া পুত্রের নবরাজ্যে আগমন করিলেন।

ছবির দল হঠাৎ মানুষ হইয়া উঠিয়াছে। এখন আর পূর্ব্বের মত সেই অবিচ্ছিন্ন শান্তি এবং অপরিবর্ত্তনীয় গাম্ভীর্য্য নাই। সংসারপ্রবাহ আপনার সুখ দুঃখ রাগ দ্বেষ বিপদ সম্পদ লইয়া এই নবীন রাজার নব রাজ্যকে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিল। এখন কেহ ভাল, কেহ মন্দ, কাহারো আনন্দ, কাহারো বিষাদ—এখন সকলে মানুষ। এখন সকলে অলংঘ্য বিধানমতে নিরীহ না হইয়া নিজের ইচ্ছামতে সাধু এবং অসাধু।

——

স্বরলিপি।

(রাজা ও রাণী হইতে)

রাগিণী মিশ্র—কাওয়ালি।

সখি, ঐ বুঝি বাঁশি বাজে!
বনমাঝে কি মনমাঝে!

বসন্ত বায় বহিছে কোথায়,
কোথায় ফুটেছে ফুল ?
বল গো সজনি   এ সুখ রজনী
কোন্‌খানে উদিয়াছে !
যাব কি যাবনা   মিছে এ ভাবনা
মিছে মরি লোকলাজে !
না জানি কোথা সে   বিরহ হুতাশে
ফিরে অভিসার সাজে !

৪।৩

॥ রা রা। ঙ্গা -া -া -া। -া -া রা সা। রা -া -সা -রসা।
॥ স খী। ঐ — — —। — — বু ঝি। বাঁ — শি —।

॥
। ন্‌া -া সা -া। -া -গা গা গা। মা -া -া -পা।
। বা — জে —। — — স খী। ঐ — — —।

। মপমা ঙ্গা রঙ্গরা সা। সরসা -ন্‌া সা -া। -ন্‌সা -রা রা রা।
। বু ঝি বাঁ শি। বা — জে —। — — স খী।

। ঙ্গা -া -া -া। -রঙ্গা -মঙ্গা রা সা। রা -া সা -রসা।
। ঐ — — —। — — বু ঝি। বাঁ — শি —।

। ন্‌া -া সা -া। {-া -া গা মা। পা -া পা -া।
। বা — জে —। {— — ব ন। মা — ঝে —।

। পা -া ধা র্সা। ঞর্সঞা -ধা পা -া। -া -মপমা গা মা।
। কি — ম ন। মা — ঝে —। — — ব ন।

। গমা -পা পা -া। পা -ধা -ঞা -ধর্সা। ঞা -ধঞধা পা -ধপা।
। মা — ঝে —। কি — — —। ম — ন —।

। মপা -মধা পা -া। -া -রা ॥ মা -া পা -া। পা -না না -া।
। মা — ঝে —। — — ॥ ব — স —। ন্ত — বা য়।

। না নর্সা ধা -না। র্সাঃ -নঃ র্সর্র্সনা -র্সা। না র্সা -া র্রা।
। ব হি ছে —। কো — পা য়। কো থা য় ফু।

। র্রা -া র্রর্সা -র্রা। র্জ্ঞা -া -া -া। র্রা র্মা র্জ্ঞর্মা -র্জ্ঞা।
। টে — ছে —। ফু — — ল্। ব ল গো —।

। র্রা র্সা র্সা -া। র্সা নর্রা র্সা -া। ঞ্জা ধা পমা -গমা।
। স্ব জ নী —। এ সু খ —। র জ নী —।

। পধা -পর্সা ঞ্জা -া। ধঞ্জা -ধা পা মপা। গা -রগা মা -া }॥
। কো -ন্ থা —। নে — উ দি। য়া — ছে — }॥

। ন্া সা রা -গা। রা মা গমা -গরা। সা রা সা রসা।
। যা ব কি —। যা ব না —। মি ছে এ ই।

। ন্া ন্া সা -া। [স]মা মা মা -া। পা -া পা ধা।
। ভা ব না —। মি ছে ম —। রি — লো ক।

। ঞ্জা -ধর্রা র্সা -া। -া -ঞ্জধপা মা মা। গমপা পা পা -া।
। লা — জে —। — — স খী। মি ছে ম —।

। পা ধপা পা -ধা। ঞ্জধা -র্রা র্সা -া। র্সা র্রা র্রা -র্জ্ঞা।
। রি লো ক —। লা — জে —। না জা নি —।

। র্রা র্মা র্জ্ঞর্মা -র্জ্ঞর্রা। র্সা নর্সর্রা র্সা -া। ঞ্জা ধা পমা -গমা।
। কো থা সে —। বি র হ —। হু তা শে —।

। পা পর্সা না না। না -া নধা -না। র্সা -না র্সর্র্সনা -র্সা}॥
। ফি রে অ ভি। সা — র —। সা — জে —}॥

চিহ্নের ব্যাখ্যা।

১। স, র, গ, ম, প, ধ, ন এই সাতটি স্বর।

উচ্চ সপ্তকের চিহ্ন রেফ্। খাদ সপ্তকের চিহ্ন হসন্ত।

২। ঙ্গ=কোমল গ; ঞ=কোমল ন; দ=কোমল ধ; ল=কোমল র; ক্ষ=কড়ি ম।

৩। উপরোক্ত স্বরাক্ষরগুলির গায়ে এক একটি আকার বসাইলেই এক এক মাত্রা কাল স্থায়ী হয়। যথা সা=এক মাত্রা; সা-া=দুই মাত্রা; সা-া -া =তিনমাত্রা ইত্যাদি। অর্দ্ধমাত্রার চিহ্ন বিসর্গ, যথা সঃ; দেড় মাত্রা, যথা সাঃ; অর্দ্ধ-মাত্রা প্রভৃতি খণ্ডমাত্রার চিহ্ন অতি অল্প স্থলেই আবশ্যক হয়—অনেক সময়েই স্বরাক্ষরগুলি একত্র করিয়া তাহার গায়ে একটি আকার দিয়া এক মাত্রার সামিলে আনা হয়। যে সুর কেবল ঈষৎ মাত্র ছুঁইয়া যায় তাহার স্থায়িত্ব-কালকে স্পর্শ-মাত্রা বলে। এই স্পর্শমাত্রার সুরগুলি ছোট অক্ষরে মূল সুরের পার্শ্বে বসাইতে হয় যথা—এই গানের তৃতীয় সুর-পংক্তির আরম্ভে "সরসা"।

৪। দুই ছেদের মধ্যবর্ত্তী সুরগুলি এক একটি তালের অন্তর্গত। প্রতি ছেদের পরবর্ত্তী সুরের উপর তালের ঝোঁক্টা পড়ে। এই ছেদ-বিভক্ত অংশগুলিকে তাল-বিভাগ বা পদ বলে। এই প্রত্যেক তাল-বিভাগ কতকগুলি মাত্রা অধিকার করিয়া থাকে। এই গানের প্রত্যেক তাল-বিভাগ চারিটি করিয়া মাত্রা অধিকার করিয়া আছে। প্রথমেই যে দুই মাত্রা দেখিতেছে, উহার সহিত প্রথম চরণের শেষ পদের দুই মাত্রা যোগ হইয়া চারি মাত্রা পূরণ হইয়াছে।

৫। গানের শিরোদেশে ৪।৩ এই যে তালাঙ্ক চিহ্ন আছে, ইহার অর্থ এই, এই গানটির অন্তর্গত প্রত্যেক তাল-বিভাগ যতটি মাত্রায় বিভক্ত তাহারই মোট সংখ্যা আকারটির বামপার্শ্বে স্থাপিত; এই গানে প্রত্যেক তাল-বিভাগে চারটি করিয়া মাত্রা আছে, এই হেতু ৪ সংখ্যা লিখিত হইয়াছে; কিন্তু আকারটির ডাহিন পার্শ্বে যে ৩ সংখ্যা লিখিত আছে ইহার অর্থ কি? ইহার অর্থ এই;—এক-এক-এক-এক; একদুই-একদুই-একদুই-একদুই; একদুইতিন-একদুইতিন-একদুইতিন-একদুইতিন; এইরূপ ভাবে সংখ্যা তাড়াতাড়ি আবৃত্তি করিলে যে কালবিলম্ব হয় তদনুসারে তাল বিভাগের অন্তর্গত প্রত্যেক মাত্রার স্থায়িত্ব-কাল নির্দ্ধারিত হয়। এক দুই তিন, এক দুই তিন, এইরূপ তিন সংখ্যা পর্য্যন্ত তাড়াতাড়ি উচ্চারণ করিতে যতটা সময় লাগে এই গানটির প্রত্যেক মাত্রা ততটা কালস্থায়ী, তাই ৩ সংখ্যা লিখিত হইয়াছে। এই পদ্ধতি অনুসারে, বিলম্ব, দ্রুত, অতিদ্রুত, প্রভৃতি আদেশ স্বতন্ত্ররূপে লিখিবার আবশ্যক হয় না—কতটা দ্রুত, কতটা বিলম্বিত, ঐ সংখ্যার দ্বারা তাহা ঠিক্ ব্যক্ত হয়।

৬। যে সুরগুলিতে গানের অক্ষর নাই—কেবল অক্ষরের টানটী চলিতেছে তাহাকে "আশ" বলে; এই টানের সুরগুলি হাইফেন বা ক্ষুদ্র কসির দ্বারা যোগ করিয়া দিতে হয় যথা:—

। পা -ধা -ঞা ধর্সা।

। কি — — — ।

৭। আস্থায়ী হইতে পুনরাবৃত্তির সাধারণ চিহ্ন ॥ যুগল-ছেদ। অন্য স্থান হইতে পুনরাবৃত্তির বিশেষ চিহ্ন { } গুম্ফবন্ধনী। যেখানে এই } বিমুখী গুম্ফবন্ধনী দেখিবে সেইখানে ছাড়িয়া

দিতে হইবে ; ছাড়িয়া দিয়া, যেখানে এই { প্রমুখী বন্ধনী দেখিবে সেইখান হইতে পুনরাবৃত্তি করিতে হইবে। যথা—এই গানের একাদশ ও শেষ পংক্তিতে "উদিয়াছে" ও "সাজে" এই কথা দুটির পরে যে } বিমুখী বন্ধনী আছে ঐখানে ছাড়িয়া দিয়া চতুর্থ পংক্তিতে "বনমাঝে"র গোড়ায় যেখানে প্রমুখী { বন্ধনী আছে সেইখান হইতে পুনরাবৃত্তি করিতে হইবে। পুনরাবৃত্তি করিয়া কোথায় ছাড়িতে হইবে? যেখানে যুগল ছেদ আছে সেইখানে ছাড়িবে। ছাড়িয়া আবার আস্থায়ীতে ফিরিয়া যাইতে হইবে। কারণ, যুগল ছেদ আস্থায়ীতে ফিরিয়া যাইবার চিহ্ন।

৮। আস্থায়ীতে ফিরিয়া গিয়া কোথায় ছাড়িয়া দিবে? যেখানে শিরোদেশে যুগল ছেদ দেখিবে। শিরোদেশস্থ যুগল ছেদ আস্থায়ীতে থামিবার কিম্বা ছাড়িয়া দিবার চিহ্ন। ঐখানে ছাড়িয়া দিয়া অন্য কলি ধরিতে হইবে কিম্বা একেবারেই ঐখানে থামিয়া যাইবে।

এই গানে কাওয়ালির ঝোঁক্ বরাবর সমান আছে—কিন্তু [illegible]মত কাওয়ালি তালের পদবিভাগের নিয়ম রক্ষা করা হয় নাই—সুতরাং সম ফাঁকের ব্যবস্থা এই গানে দেখাইবার আবশ্যক নাই।

চন্দ্রনাথ বাবুর স্বরচিত লয়তত্ত্ব।

পাঠকদের স্মরণ থাকিতে পারে, পরব্রহ্মে বিলীন হইয়া যাই-বার চেষ্টাই হিন্দুর বিশেষত্ব এবং সেই বিশেষত্ব একান্ত যত্নে রক্ষা করাই আমাদের কর্ত্তব্য চন্দ্রনাথ বাবু এইরূপ উপদেশ

দিয়াছিলেন। আমাদের ভিন্নরূপ মানসিক প্রকৃতিতে ভিন্নরূপ ধারণা হওয়ায় সাধনায় চন্দ্রনাথ বাবুর প্রতিবাদ করিয়াছিলাম।

ইহাতে চন্দ্রনাথ বাবু আমাদের উপর রাগ করিয়াছেন। রাগ করিবার একটা কারণ দেখাইয়াছেন যে, "পূর্ব্ব প্রবন্ধে একথা যে রকম করিয়া বুঝাইয়াছি তাহাতেও যদি কেহ না বুঝেন তবে তিনি এ কথা বুঝিতে হয় অসমর্থ না হয় অনিচ্ছুক।" দৈবাৎ তাঁহারই বুঝাইবার কোন ত্রুটি ঘটিতেও পারে, মুনিনাংচ মতিভ্রমঃ, এরূপ সংশয় মাত্র চন্দ্রনাথ বাবুর মনে উদয় হইতে পারিল না অতএব যে দুঃসাহসিক তাঁহার সহিত একমত হইতে পারে নাই সেই নরাধম। যুক্তিটা যদিও তেমন পাকা নহে এবং ইহাতে নম্রতা ও উদারতার কিঞ্চিৎ অভাব প্রকাশ পায়, তথাপি, তর্কস্থলে এরূপ যুক্তি অনেকেই প্রয়োগ করিয়া থাকেন, চন্দ্রনাথ বাবুও যদি সেই পথে যান, তবে আমরা তাঁহাকে মহাজন জানিয়াও ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করিতে ইচ্ছা করি।

প্রবন্ধের উপসংহারে চন্দ্রনাথ বাবু রাগের মাথায়, আমাদিগকে অথবা কাহাকে ঠিক জানি না, স্বজাতিদ্রোহী বলিয়াছেন। বিশুদ্ধ জ্ঞানানুশীলনার মধ্যেও লোকে পরস্প এমন সকল কঠিন কথা বলিয়া থাকে! অতএব, চন্দ্রনাথ বাবু যে বলিয়াছেন ক্ষুদ্রতা হইতে যতই ব্যাপকতার দিকে উত্থান করা যায় ততই তীব্রতা দুর্দ্দমনীয়তার হ্রাস হয়, সে কথা সপ্রমাণ হইতেছে না। আমাদের বক্তব্য এই, যে, সত্য স্বজাতি অপেক্ষা ব্যাপক, এবং নব্য গুরুদিগের অপেক্ষা প্রাচীন, অতএব আমরা সত্যদ্রোহী হওয়াকেই সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর অপরাধ জ্ঞান করি।

চন্দ্রনাথ বাবু যে প্রবন্ধটি লিখিয়াছেন, তাহা, আকারে যদিও

বৃহৎ, কিন্তু তাহার মূল কথা দুটি একটির অধিক নহে অতএব আসল তর্কটা সংক্ষেপে সারিতে পারিব এরূপ আশা করা যায়।

চন্দ্রনাথ বাবু বলেন, হিন্দুর লয়তত্ত্বের অর্থ সগুণ অবস্থা পরিত্যাগ করিয়া নির্গুণ অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া। কিন্তু এই নির্গুণ অবস্থা প্রাপ্ত হইতে গেলে যে একেবারেই সংসারে বিমুখ হইতে হইবে তাহা নহে, বরঞ্চ সংসারধর্ম্ম পালন সেই অবস্থা প্রাপ্তির একটি মুখ্য সোপান। কারণ, যাঁহারা মনে করেন নির্গুণ অবস্থা লাভের অর্থ আত্মনাশ "তাঁহারা বড় ভুল বুঝেন— তাঁহারা বোধ হয় তাঁহাদের মানসিক ও আধ্যাত্মিক প্রকৃতির সঙ্কীর্ণতা বা বিকৃতি বশতঃ আমাদের লয়তত্ত্বে প্রবেশ করিতে একেবারেই অসমর্থ।" তাঁহার মতে নির্গুণতা প্রাপ্তির অর্থ "আত্মসম্প্রসারণ।" স্বার্থপরতা হইতে পরার্থপরতা এবং পরার্থপরতা হইতে ব্রহ্মজ্ঞানানুশীলনের সাহায্যে ক্রমশঃ নির্গু[illegible] আত্মসম্প্রসারণ, ভিন্ন ভিন্ন পর্য্যায় মাত্র। অতএব পরা[illegible] সম্যক্ অভ্যাসের জন্য সংসার-ধর্ম্ম পালন অত্যাবশ্যক। আব[illegible] যাঁহারা বলেন লয়তত্ত্ব মানিয়া চলিতে গেলে বিজ্ঞান শিক্ষা সৌন্দর্য্য চর্চ্চা দূর করিতে হয় তাঁহারাও ভ্রান্ত। কারণ, "পদার্থ-বিদ্যা প্রাণীবিদ্যা প্রভৃতি যাহাতে সৃষ্টিকৌশল ব্যাখ্যাত হয়, বিশ্বনাথের বিপুল বিচিত্র লীলা বর্ণিত হয় সে সকলই লয়-প্রার্থীর অনুশীলনের জিনিষ।" "বিশ্বের সৌন্দর্য্য, বিশ্বের মাধুরী, বিশ্বের মধুময়তা (এই তিনটি শব্দবিন্যাসের মধ্যে বিশেষ যে অর্থবৈচিত্র্য আছে আমার বোধ হয় না। শ্রীরঃ) ব্রহ্মভক্ত ব্রহ্মপিপাসু ব্রহ্মচারী যেমন অনুভব করিবেন আর কেহই তেমন করিবেন না।" "প্রকৃত সৌন্দর্য্যে মানুষকে ব্রহ্মেই জাইয়া দেয়।"

মোট কথাটা এই। এক্ষণে, যদিও আশঙ্কা আছে আমাদের বুদ্ধিহীনতা অথবা অসারল্য, আমাদের মানসিক ও আধ্যাত্মিক প্রকৃতির সঙ্কীর্ণতা ও বিকৃতি সম্বন্ধে চন্দ্রনাথ বাবুর প্রত্যয় উত্তরোত্তর অধিকতর বদ্ধমূল হইয়া যাইবে, তথাপি আমাদিগকে অগত্যা স্বীকার করিতেই হইবে এবারে আমরা চন্দ্রনাথ বাবুর কথা কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।

সগুণে নির্গুণে এমন একটা খিচুড়ি পাকাইয়া তোলা পূর্ব্বে আমরা কোথাও দেখি নাই।

প্রথম কথা। ক্ষুদ্র অনুরাগ হইতে বৃহৎ অনুরাগ, বুঝিতে পারি, কিন্তু বৃহৎ অনুরাগ হইতে নিরনুরাগের মধ্যে ক্রমবাহী যোগ কোথায় বুঝিতে পারি না।

যদি কেহ বলেন, অনুরাগের ব্যাপকতা অনুসারে তাহার ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া আসে সে কথা প্রামাণ্য নহে। ...বে হ্রাস হইয়া আর এক ভাবে বৃদ্ধি হয়। প্রকৃত দেশানুরাগ যে গৃহানুরাগের অপেক্ষা ক্ষীণবল ইতিহাসে এরূপ সাক্ষ্য দেয় না, দেশানুরাগের অপেক্ষা প্রকৃত সার্ব্বজনীন প্রীতি যে নিস্তেজ এমন কথা কাহার সাধ্য বলে! বড় বড় অনুরাগে একেবারে প্রাণ লইয়া টানাটানি। দেশহিতের জন্য, লোকহিতের জন্য, ধর্ম্মের জন্য মহাত্মারা যে অকাতরে প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছেন তাহা যে কত বড় "বিরাট" অনুরাগের বলে, তাহা আমরা ঘরে বসিয়া অনুমান করিতেই পারি না। এই যে অনুরাগের উত্তরোত্তর বিশ্বব্যাপী বিস্তার ইহাকেই কি নির্গুণ লয় বলে? প্রীতি কি কখনও প্রীতিহীনতার দিকে আকৃষ্ট হয়? আত্মপ্রেম হইতে বিশ্বপ্রেম, বিশ্বপ্রেম হইতে সগুণ ঈশ্বরপ্রেমের মধ্যে একটি পরস্পরসংলগ্ন পরিণিতর পর্য্যায় আছে

কিন্তু "হাঁ"-কে বড় করিয়া "না" করা যায় এ কথা বিশ্বাস করিতে যেরূপ অসাধারণ মানসিক প্রকৃতির আবশ্যক আমাদের তাহা নাই স্বীকার করিতে হয়।

দ্বিতীয় কথা। "সৃষ্টিকৌশলের" মধ্যে "বিশ্বনাথের বিপুল বিচিত্র লীলা" দেখিয়া লয়প্রার্থী কি করিয়া যে ব্রহ্মের নির্গুণ-স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হন তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। "লীলা" কি নির্গুণতা প্রকাশ করে? "লীলা" কি ইচ্ছাময়ের ইচ্ছাশক্তির বিচিত্র বিকাশ নহে? "সৃষ্টি-কৌশল" জিনিষটা কি নির্গুণ ব্রহ্মের সহিত কোন যুক্তিসূত্রে যুক্ত হইতে পারে?

সৌন্দর্য্যের একমাত্র কার্য্য চিত্তহরণ করা অর্থাৎ হৃদয়ের মধ্যে প্রেমের আকর্ষণ সঞ্চার করিয়া দেওয়া। যাঁহারা প্রেমস্বরূপ সগুণ ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন সৃষ্টির সৌন্দর্য্যে তাঁহাদিগকে ঈশ্বরের প্রেম স্মরণ করাইয়া দেয়। ঈশ্বর যে আমাদিগকে ভালবাসেন এই সৌন্দর্য্য বিকাশ করিয়াই যেন তাহার পরিচয় দিয়াছেন। তিনি যে কেবল আমাদিগকে অমোঘ নিয়মপাশে বাঁধিয়া আমাদিগকে বলপূর্ব্বক কাজ করাইয়া লইতে চান তাহা নহে, আমাদের মনোহরণের প্রতিও তাঁহার প্রয়াস আছে। এই বিশ্বের সৌন্দর্য্যে তিনি আমাদিগকে বংশিস্বরে আহ্বান করিতেছেন—তিনি জানাইতেছেন তিনিও আমাদের প্রীতি চান। বৈষ্ণবদের কৃষ্ণরাধার রূপক এই বিশ্বসৌন্দর্য্য ও প্রেমের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। কৃষ্ণ কি নির্গুণ ব্রহ্ম? চন্দ্রনাথ বাবু কি বলিবেন জানি না, কিন্তু চৈতন্যদেব অন্যরূপ বলেন। তিনি াহংব্রহ্মবাদীদিগকে "পাষণ্ড" বলিয়াছেন। সে যাহাই হোক্, ৌন্দর্য্য বিরাট লয়প্রার্থীদিগকে যে কি করিয়া নির্গুণ ব্রহ্মে

"মজাইতে" পারে তাহা বুঝিতে পারিলাম না। সেটা আমাদের বুদ্ধির দোষ হইতে পারে এবং সে জন্য চন্দ্রনাথ বাবু আমাদিগকে যথেচ্ছা গালি দিবেন, আমরা নির্ব্বোধ ছাত্র-বালকের মত নতশিরে সহ্য করিব, কিন্তু অবশেষে বুঝাইয়া দিবেন।

চন্দ্রনাথ বাবু তাঁহার প্রবন্ধের একস্থানে প্রহ্লাদ ও নারদের দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার স্মরণ করা উচিত ছিল প্রহ্লাদ ও নারদ উভয়েই বৈষ্ণব। উভয়েই ভক্ত এবং প্রেমিক। প্রহ্লাদের কাহিনীতে ঈশ্বরের সগুণতার যেরূপ দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে পুরাণের অন্য কোন কাহিনীতে সেরূপ দেওয়া হয় নাই। প্রকৃত ভক্তির বশে ভক্তের কাছে ঈশ্বর যে কিরূপ প্রত্যক্ষভাবে ধরা দেন ইহাতে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে। যে ঈশ্বর নানা বিপদ হইতে ভক্তকে কোলে করিয়া রক্ষা করিয়াছেন এবং অবশেষে নৃসিংহ মূর্ত্তি ধরিয়া দৈত্যকে সংহার করিয়াছেন তিনি কি নির্গুণ ব্রহ্ম?

প্রসঙ্গক্রমে চন্দ্রনাথ বাবু বঙ্কিম বাবুকে এক স্থলে সাক্ষ্য মানিয়াছেন। কিন্তু বঙ্কিম বাবু শ্রীকৃষ্ণকে গুণের আদর্শরূপে খাড়া করিয়া তাঁহারই অনুকরণের জন্য আমাদিগকে উৎসাহিত করিয়াছেন—নির্গুণতাকে আদর্শ করিয়া অপরূপ পদ্ধতি অনুসারে আত্মসম্প্রসারণ করিতে বলেন নাই।

আসল কথা, যাঁহারা যথার্থ লয়তত্ত্ববাদী, তাঁহারা লয়কে লয়ই বলেন, ইংরাজি শিখিয়া তাহাকে আত্মসম্প্রসারণ বলেন না। তাঁহাদের কাছে সৌন্দর্য্য কদর্য্য কিছুই নাই, এই জন্য তাঁহারা অতি কুৎসিৎবস্তু ও চন্দনকে সমান জ্ঞান করেন। জগৎ তাঁহাদের কাছে যথার্থই অসৎ, মায়া, বিশ্বনাথের সৃষ্টিকৌশল ও লীলা নহে।

মরুভূমি যেমন বিরাট এ তত্ত্বও তেমনি বিরাট, কিন্তু তাই বলিয়া ধরণীর বিচিত্র শস্যক্ষেত্রকে মরুভূমি করা যায় না; অকাতরে আত্মহত্যা করার মধ্যে একটা বিরাটত্ব আছে কিন্তু তাই বলিয়া প্রাণীদিগকে সেই বিরাটত্বে নিয়োগ করা কোন জাতিবিশেষের একমাত্র কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলা যায় না। প্রেম প্রবল মোহ, জগৎ প্রকাণ্ড প্রতারণা এবং ঈশ্বর নাস্তিকতার নামান্তর এ কথা বিশ্বাস না করিলেও সংসারে "বিরাটভাব" চর্চ্চার যথেষ্ট সামগ্রী অবশিষ্ট থাকিবে।

আসল কথা, চন্দ্রনাথ বাবু নিজের সহৃদয়তাগুণে লয়তত্ত্ব সম্যক্ গ্রহণ করিতে না পারিয়া ফাঁপরে পড়িয়াছেন। অথচ সেই সহৃদয়তাই দেশানুরাগের আকার ধারণ করিয়া তাঁহার নিকটে লয়তত্ত্বের সর্ব্বোৎকৃষ্ট মাহাত্ম্য প্রমাণের [illegible] রিতেছে। সেই হৃদয়ের প্রাবল্যবশতঃই তিনি অকস্মাৎ [illegible]। আমাদিগকে গালি দিয়াছেন, এবং ভরসা করি, সেই সহৃদয়তাগুণেই তিনি আমাদের নানারূপ প্রগল্‌ভতা মার্জ্জনা করিবেন।

লণ্ডনে।

(য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারি।)

১২ সেপ্টেম্বর। আমাদের বন্ধুর একটি গুণ আছে তিনি যতই কল্পনার চর্চ্চা করুন না কেন, কখনো পথ ভোলেন না। সুতরাং তাঁকেই আমাদের লণ্ডনের পাণ্ডাপদে বরণ করেছি। আমরা যেখানে যাই তাঁকে সঙ্গে টেনে নিয়ে যাই, এবং তিনি

যেখানে যান আমরা কিছুতেই তাঁর সঙ্গ ছাড়িনে। কিন্তু একটা আশঙ্কা আছে এ রকম অবিচ্ছেদ্য বন্ধুত্ব এ পৃথিবীতে সকল সময় সমাদৃত হয় না। হায়! এ সংসারে কুসুমে কণ্টক, কলানাথে কলঙ্ক এবং বন্ধুত্বে বিচ্ছেদ আছে—কিন্তু, ভাগ্যিস্ আছে!

আজ বন্ধুসহায় হয়ে নিশ্চিন্ত মনে সহর ঘোরা গেল। ন্যাশ-নাল্ গ্যালারিতে ছবি দেখ্‌তে গেলুম। বড় ভয়ে ভয়ে দেখ্‌লুম। কোন ছবি পুরোপুরি ভাল লাগ্‌তে দিতে দ্বিধা উপস্থিত হয়। সন্দেহ হয়, কোন প্রকৃত সমজ্‌দারের এ ছবি ভাল লাগা উচিত কি না। আবার যে ছবি ভাল লাগে না তার সম্বন্ধেও মুখ ফুটে' কোন কথা বল্‌তে পারিনে।

১৫ সেপ্টেম্বর। স্যাভয় থিয়েটারে "গণ্ডোলিয়র্স" নামক একটি গীতিনাট্য অভিনয় দেখ্‌তে গিয়েছিলুম। আলোকে, সঙ্গীতে, সৌন্দর্য্যে, বিবিধ বর্ণবিন্যাসে, দৃশ্যে, নৃত্যে, হাস্যে, কৌতুকে মনে হল্ একটা কোন্ কল্পরাজ্যে আছি। মাঝে এক অংশে অনেকগুলি নর্ত্তক নর্ত্তকীতে মিলে নৃত্য আছে; সেখানে আমার মনে হল আমার চারিদিকে যেন কিছুক্ষণ ধরে' কিন্নর লোক থেকে সৌন্দর্য্যের অজস্র পুষ্পবৃষ্টি হয়ে গেল। যেন, হঠাৎ এক সময়ে একটা উন্মাদকর যৌবনের বাতাসে পৃথিবী জুড়ে' সুন্দর নর নারীর একটা উলট্-পালট্ ঢেউ উঠেছে—তাতে আলোক এবং বর্ণচ্ছটা, সঙ্গীত এবং উৎফুল্ল নয়নের উজ্জ্বল হাসি সহস্র ভঙ্গীতে চারিদিকে ঠিক্‌রে পড়চে।

১৬ সেপ্টেম্বর। আজ আমাদের গৃহস্বামিনীর কুমারী কন্যা আমার কতকগুলি পুরাতন পূর্ব্বশ্রুত সুর পিয়ানোতে বাজা-চ্ছিলেন। শুনে আমার সেই গৃহ মনে পড়তে লাগ্‌ল! সেই

ভারতবর্ষের রৌদ্রালোকিত প্রাতঃকাল, মুক্ত বাতায়ন, অব্যাহত আকাশ এবং পিয়ানো যন্ত্রে এই স্বপ্নবহ পরিচিত সঙ্গীতধ্বনি।

১৭ সেপ্টেম্বর। যে দুর্ভাগার শীতকোর্ত্তা আমরা বহন করে' করে' বেড়াচ্ছি, ইণ্ডিয়া আপিস যোগে সে আমাদের একটি পত্র লিখেছে—আমরাই যে তার গাত্রবস্ত্রটি সংগ্রহ করে' এনেছি সে বিষয়ে পত্রলেখক নিজের দৃঢ় বিশ্বাস প্রকাশ করেছে; "ভ্রম-ক্রমে" বলে' একটা শব্দ ব্যবহার করেছিল, কিন্তু সেটা আমার মনে হল মৌখিক শিষ্টতা মাত্র। কিন্তু সন্তোষের বিষয়, যার কম্বল নিয়েছিলুম এটা তার নয়। ভ্রমক্রমে দুবার একজনের গরম কাপড় নিলে ভ্রম সপ্রমাণ করা কিছু কঠিন হত।

১৯ সেপ্টেম্বর। এখানে রাস্তায় বেরিয়ে সুখ আছে। সুন্দর মুখ চোখে পড়বেই। শ্রীযুক্ত দেশানুরাগ যদি পারেন ত আমাকে ক্ষমা করবেন, কিন্তু আমার বিশ্বাস, ইংরাজ মেয়ের মত সুন্দরী পৃথিবীতে নেই। নবনীর মত সুকোমল শুভ্র রঙের উপরে একখানি পাতলা টুক্‌টুকে ঠোঁট, সুগঠিত নাসিকা, এবং দীর্ঘ পল্লববিশিষ্ট নির্ম্মল নীলনেত্র;—দেখে' পথকষ্ট দূর হয়ে যায়। শুভানুধ্যায়ীরা শঙ্কিত এবং চিন্তিত হবেন, এবং প্রিয় বয়স্যেরা পরিহাস করবেন কিন্তু এ কথা আমাকে স্বীকার করতেই হবে সুন্দর মুখ আমার সুন্দর লাগে। তাই যদি না লাগ্‌ত ত বি-ধাতার উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হত। ঈফেল্‌ স্তম্ভের চতুর্থ চূড়াও আমার তেমন আশ্চর্য্য বোধ হয় না, একখানি সুন্দর মুখের সুমিষ্ট হাসি যেমন লাগে। সুন্দর হওয়া এবং মিষ্ট করে' হাসা মানু-ষের যেন একটি পরমাশ্চর্য্য ক্ষমতা। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমার ভাগ্যক্রমে ঐ হাসিটা এদেশে এসে কিছু বাহুল্য পরিমাণে দেখ্‌তে পাই। এমন অনেক সময়ে হয়, রাজপথে কোন নীল-

নয়না পান্থরমণীর যেমন সম্মুখবর্ত্তী হই অম্‌নি সে আমার মুখের দিকে চেয়ে আর হাসি সম্বরণ করতে পারে না। তখন তাকে ডেকে বলে' দিতে ইচ্ছা করে, "সুন্দরি, আমি হাসি ভালবাসি বটে, কিন্তু এতটা নয়। তা ছাড়া বিম্বাধরের উপর হাসি যতই সুমিষ্ট হোক্ না কেন, তারো একটা যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকা চাই; কারণ, মানুষ কেবলমাত্র যে সুন্দর তা নয়, মানুষ বুদ্ধিমান জীব। হে নীলাজনয়নে, আমি ত ইংরাজের মত অসভ্য খাটো কুর্ত্তি এবং অসঙ্গত লম্বা ধুচুনি টুপি পরিনে, তবে হাস কি দেখে'? আমি সুশ্রী কি কুশ্রী সে বিষয়ে কোন প্রসঙ্গ উত্থাপন করা রুচিবিরুদ্ধ—কিন্তু এটা আমি খুব জোর করে' বল্‌তে পারি বিদ্রূপের তুলি দিয়ে বিধাতাপুরুষ আমার মুখমণ্ডল অঙ্কিত করেন নি। তবে যদি রংটা কালো এবং চুলগুলো কিছু লম্বা দেখে' হাসি পায় তাহলে এই পর্য্যন্ত বল্‌তে পারি, প্রকৃতিভেদে হাস্যরসসম্বন্ধে অদ্ভুত রুচিভেদ লক্ষিত হয়। তোমরা যাকে "হিউমার্" বল, আমার মতে কালো রঙের সঙ্গে তার কোন কার্য্যকারণ সম্বন্ধ নেই। দেখেছি বটে, তোমাদের দেশে মুখে কালী মেখে কাফ্রি সেজে নৃত্যগীত করা একটা কৌতুকের মধ্যে গণ্য হয়ে থাকে। কিন্তু, কনক-কেশিনি, সেটা আমার কাছে নিতান্ত হৃদয়হীন বর্ব্বরতা বলে' বোধ হয়।"

২২ সেপ্টেম্বর। আজ সন্ধ্যার সময় গোটাকতক বাঙ্গালা গান গাওয়া গেল। তার মধ্যে গুটি দুই তিন এখানকার শ্রোত্রীগণ বিশেষ পছন্দ করেচেন। আশা করি, সেটা কেবলমাত্র মৌখিক ভদ্রতা নয়। তবে চাণক্য বলেচেন "বিশ্বাসং নৈব কর্ত্তব্যং স্ত্রীষু রাজকুলেষু চ।" এঁরা একে স্ত্রীলোক, তাতে আবার আমাদের রাজকুল ইংরাজকুলও বটেন।

২৩ সেপ্টেম্বর। আজকাল সমস্ত দিনই প্রায় জিনিষপত্র কিনে দোকানে দোকানে ঘুরে কেটে যাচ্চে। বাড়ি ফিরে এলেই আমার বন্ধু বলেন, এস বিশ্রাম করি গে। তার পরে আমরা খুব সমারোহের সহিত বিশ্রাম করতে যাই। শয়নগৃহে প্রবেশ করে' আমার বান্ধব অনতিবিলম্বে শয্যাতল আশ্রয় করেন, আমি পার্শ্ববর্ত্তী একটি সুগভীর কেদারার মধ্যে নিমগ্ন হয়ে বসি। তার পরে, আমরা কোন বিদেশী কাব্যগ্রন্থ পাঠ করি, না হয়, দুজনে মিলে' জগতের যত কিছু অতলস্পর্শ বিষয় আছে, দেখ্‌তে দেখ্‌তে তার মধ্যে তলিয়ে অন্তর্ধান হয়ে যাই। আজ কাল এই ভাবে এতই অধিক বিশ্রাম করচি, যে, কাজের আর তিলমাত্র অবকাশ থাকে না। ড্রয়িংরুমে ভদ্রলোকেরা গীতবাদ্য সদালাপ করেন, আমরা তার সময় পাইনে, আমরা বিশ্রামে নিযুক্ত। শরীর রক্ষার জন্যে সকলে কিয়ৎকাল মুক্ত বায়ুতে ভ্রমণাদি করে থাকেন, সে হ'তেও আমরা বঞ্চিত, আমরা এত অধিক বিশ্রাম করে' থাকি। রাত দুটো বাজ্‌ল, আলো নিবিয়ে দিয়ে সকলেই আরামে নিদ্রা দিচ্চে, কেবল আমাদের দুই হত-ভাগ্যের ঘুমোবার অবসর নেই, আমরা তখনো অত্যন্ত দুরূহ বিশ্রামে ব্যস্ত।

২৫ সেপ্টেম্বর। আজ এখানকার একটি ছোটখাট এক্‌-জিবিশ্‌ন দেখ্‌তে গিয়েছিলুম। শুন্‌লুম, এটা প্যারিস্‌ এক-জিবিশনের অত্যন্ত সুলভ এবং সংক্ষিপ্ত দ্বিতীয় সংস্করণ। সেখানে চিত্রশালায় প্রবেশ করে' কারোলু ডুরাঁ নামক একজন বিখ্যাত ফরাসী চিত্রকররচিত একটি বসনহীনা মানবীর ছবি দেখ্‌লুম। কি আশ্চর্য্য সুন্দর! সুন্দর মানবশরীরের মত সৌন্দর্য্য পৃথিবীতে আর কিছু নেই। আমরা প্রকৃতির সকল শোভাই

দেখি, কিন্তু মর্ত্ত্যের এই চরম সৌন্দর্য্যের উপর, জীব-অভি-ব্যক্তির এই সর্ব্বশেষ কীর্ত্তিখানির উপর, মানুষ স্বহস্তে একটি চির-অন্তরাল টেনে রেখে দিয়েছে। এই ছবিখানি দেখ্‌লে চেতনা হয় পশু মানুষ বিধাতার স্বহস্তরচিত একটি মহিমাকে বিলুপ্ত করে' রেখেচে, এবং চিত্রকর মনুষ্যরচিত অপবিত্র আব-রণ উদ্‌ঘাটন করে' সেই দিব্য সৌন্দর্য্যের আশ্চর্য্য আভাস দিয়ে দিলে। যবনিকার এক প্রান্ত তুলে ধরে' বল্লে, দেখ, দেখ, তোমরা কোন্ লক্ষ্মীকে অন্ধকারে নির্ব্বাসিত করে' রেখেছ! এই দেহ-খানির স্নিগ্ধ শুভ্র কোমলতা এবং প্রত্যেক সুঠাম সুনিপুণ ভঙ্গিমার উপরে সেই অসীমসুন্দরের সযত্ন অঙ্গুলির সদ্যস্পর্শ দেখা যায় যেন। এ কেবলমাত্র দেহের সৌন্দর্য্য নয়, যদিও দেহের সৌন্দর্য্য যে বড় সামান্য এবং সাধুজনের উপেক্ষণীয় তা' বল্‌তে পারিনে—কিন্তু এতে আরো অনেকখানি গভীরতা আছে। একটি প্রীতিরমণীয় সুকোমল নারীপ্রকৃতি, একটি অমর সুন্দর মানবাত্মা এর মধ্যে বাস করে, তারি দিব্য লাবণ্য এর সর্ব্বত্র উদ্ভাসিত হয়ে উঠ্‌চে। দূর থেকে চকিতের মত মানব-অন্তঃকরণের সেই অনির্ব্বচনীয় চির-রহস্যকে দেহের স্ফটিক বাতায়নে একটুখানি যেন দেখা গেল!

২৭ সেপ্টেম্বর। আজ লাইসীয়ম্ নাট্যশালায় গিয়েছিলুম। স্কট্ রচিত "ব্রাইড্ অফ্ লামারমুর" উপন্যাস নাট্যাকারে অভি-নীত হয়েছিল। বিখ্যাত অভিনেতা আর্ভিং নায়ক সেজেছিলেন। তাঁর নিতান্ত অস্পষ্ট উচ্চারণ এবং অদ্ভুত অঙ্গভঙ্গী, কিন্তু তৎসত্ত্বেও তিনি কি এক নাট্যকৌশলে ক্রমশঃ অলক্ষ্যে দর্শকদের হৃদয়ে সম্পূর্ণ আধিপত্য স্থাপন করতে পারেন।

আমাদের সুমুখবর্ত্তী একটি বক্সে দুটি মেয়ে বসেছিল।

তার মধ্যে একটি মেয়ের মুখ রঙ্গভূমির সমস্ত দর্শকের চিত্ত এবং দূরবীন আকৃষ্ট করেছিল। নিখুঁৎ সুন্দর ছোট মুখখানি, অল্প বয়স, দীর্ঘ বেণী পিঠে ঝুল্‌চে—বেশভূষার আড়ম্বর নেই। অভিনয়ের সময় যখন সমস্ত আলো নিবিয়ে দিয়ে কেবল ষ্টেজের আলো জ্বল্‌ছিল এবং সেই আলো ষ্টেজের অনতিদূরবর্ত্তী তার আধখানি মুখের উপর এসে পড়েছিল—তখন তার আলোকিত সুন্দর সুকুমার মুখের রেখা এবং সুভঙ্গিম গ্রীবা অন্ধকারের উপর চমৎকার চিত্র রচনা করেছিল। হিতৈষীরা আমাকে পুনশ্চ মার্জ্জনা করবেন—অভিনয়কালে বারবার সেদিকে আমার দৃষ্টি বদ্ধ হয়েছিল। কিন্তু দূরবীন কষাটা আমার আসে না। নির্লজ্জ স্পর্দ্ধার সহিত পরস্পরের প্রতি অসঙ্কোচে দূরবীন প্রয়োগ করা নিতান্ত রূঢ় মনে হয়। এদের মধ্যে কতকগুলো অভদ্র প্রথা আছে—যত কালই এদের সংসর্গে থাকি সেগুলো আমাদের যেন অভ্যাস হয়ে না যায়! যেমন ঘূর্ণী নাচ—বিশেষতঃ ওয়াল্‌ট্‌জ্‌, মেয়েদের নাচবস্ত্র, পুরুষদের খাটো কুর্ত্তি, নাট্যশালার দূরবীন কষা, নিমন্ত্রণসভায় কাউকে গানবাজনায় প্রবৃত্ত করে' দিয়ে গল্প জুড়ে দেওয়া।

২ অক্টোবর। একটি গুজরাটীর সঙ্গে দেখা হল। ইনি ভারতবর্ষ থেকে সমস্ত পথ জাহাজের ডেকে চড়ে' এসেচেন। তখন শীতের সময়। মাছ মাংস খান না। সঙ্গে চিঁড়ে শুষ্ক ফল প্রভৃতি কিছু ছিল এবং জাহাজ থেকে শাক্ সব্‌জি কিছু সংগ্রহ করতেন। ইংরাজি অতি সামান্য জানেন। গায়ে শীতবস্ত্র অধিক নেই। লণ্ডনে স্থানে স্থানে উদ্ভিজ্জ ভোজের ভোজনশালা আছে সেখানে ছয় পেনিতে তাঁর আহার সমাধা হয়। যেখানে যা' কিছু দ্রষ্টব্য জ্ঞাতব্য বিষয় আছে সমস্ত অনুসন্ধান করে'

বেড়ান। বড় বড় লোকের সঙ্গে অসঙ্কোচে সাক্ষাৎ করেন। কিরকম করে' কথাবার্ত্তা চলে বলা শক্ত। মধ্যে মধ্যে কার্ডিনাল্ ম্যানিঙের সঙ্গে ধর্ম্মালোচনা করে' আসেন। ইতিমধ্যে একৃজিবিশনের সময় প্যারিসে ছই মাস যাপন করে' এসেচেন এবং অবসরমত অ্যামেরিকায় যাবার সঙ্কল্প করচেন। ভারতবর্ষে এঁকে আমি জানতুম। ইনি বাঙ্গলা শিক্ষা করে' অনেক ভাল বাঙ্গলা বই গুজরাটিতে তর্জ্জমা করেচেন। এঁর স্ত্রীপুত্র পরিবার কিছুই নেই। ভ্রমণ করা, শিক্ষা করা, এবং স্বদেশীয় সাহিত্যের উন্নতি সাধন করা এঁর একমাত্র কাজ। লোকটি অতি নিরীহ, শীর্ণ, খর্ব্ব, পৃথিবীতে অতি অল্প পরিমাণ স্থান অধিকার করেন। এঁকে দেখে আমার আশ্চর্য্য বোধ হয়।

পুরুৎ ঠাক্‌রুণ।

পুরুৎ ঠাকরুণ পাকা মাথায় সিন্দূর পরেন, বয়স তাঁর ষষ্ঠি বর্ষ। তা হলে কি হয়, এখনও পুরোহিত ঠাকুর হারাধন শর্ম্মার তিনি মরণ কাঠি জিয়ন্ কাঠি। শাঁখা বাজাইয়া, নথ দোলাইয়া ঠাকুরাণীটি যখন ঝঙ্কার করেন, তখন ঠাকুরটির হরিনাম ভুল হইয়া যায়, পরিণাম স্মরণ থাকে না, মনে হয় বুঝি বার্দ্ধক্যের এখনও কিঞ্চিৎ বিলম্ব আছে।

পুত্রবধূ এবং কন্যাগণের শয্যাত্যাগের পূর্ব্বে ঠাকুরাণীর ফুল বিল্বপত্র সংগ্রহ শেষ হইয়া যায়। পট্টবস্ত্রপরিহিতা এবং চর্চ্চিতসিন্দূর শ্বেতসীমন্তিনী পুরোহিত ঠাকুরাণীটিকে অতি প্রত্যূষে ফুলের বাগানে বা বেলতলায় সাজি হাতে ঘুরিতে দেখিয়া সেকালের লোকের তাঁহাকে বনদেবী বলিয়া মনে হইত।

একালের ঝি বউ কিন্তু লুকাইয়া লুকাইয়া তাঁহার অন্যরকম নামকরণ করিয়াছে। খাশুড়ির একাদশীর দিন রায়েদের বউ যখন এইমাত্র শয্যা ত্যাগ করিয়া খিড়কির ঘাটে মুখ ধুইতে-ছিলেন, পুরুৎ ঠাক্রুণ তখন সাজি হাতে হন্ হন্ করিয়া বাড়ি ফিরিয়া যাইতেছেন। বউকে দেখিয়া ডানিহাতের সাজি বামে রাখিয়া ঠাকুরাণী একটু থমকিয়া দাঁড়াইলেন এবং তাচ্ছিল্যে বলিয়া উঠিলেন—"একেই বলে কলির মেয়ে! বুড়ো শাশুড়ি একাদশী করে ঘরে পড়ে', বউ উঠ্‌লেন কিনা বেলা চার দণ্ডের সময়!" সেই দিন থেকে রায়েদের বউ পুরোহিতানীকে নাকি সমবয়স্কাদের কাছে অতি সঙ্গোপনে "পুরুৎ প্রেতিনী" বলিয়া পরিচিত করিয়াছিলেন। দুই দিন উপ্‌রি উপ্‌রি রাঁধিয়া চাটুয্যেদের সাধের মেজবউর ব্যামোহ হইয়াছিল—তাকে দেখিতে গিয়া ঠাক্রুণ বলিয়াছিলেন—"কি বাবুই হয়ে উঠ্‌লি তোরা? এই একটু অসুখ করেচে, এর জন্যে লোকে জানাজানি! আমর হলে মরে যেতুম!" সেই দিন হইতে মেজ বৌ তাঁর নাম দিয়া ছিলেন "পুরুৎ রাক্ষসী!" পরে যে রায়েদের বউতে আর মে বউতে বেগুণফুল পাতান হইয়াছিল সেটা এইরূপ মতের ঐ এবং প্রবল সহানুভূতির ফল।

ফুলের সাজি পূজার ঘরে রাখিয়া কাপড় ছাড়িয়া ঠা যখন কুট্‌নো কুট্‌তে বসেন, তখন তাঁর আর এক মূর্ত্তি। বুঝিয়া সে মূর্ত্তি বৈচিত্র্যময়ী। শাকসব্‌জি তরকারির অনটন সেদিন ভীমামূর্ত্তি, সম্মুখে প্রকাণ্ড বঁটি, হাতে ক ঘস্ ঘস্ শব্দ, মুখে পুত্রবধূদের এবং কখন কখন ক ত্রিকুলের শাখাপল্লবিত পরিচয়। তাই যারা ছেলে অসুখের জন্য পুরুত ঠাকুরাণীর কাছে উপদেশ এব

প্রার্থনা করিতে আসে, তাহারা কেহ প্রায় রিক্তহস্তে দেবীদর্শনে আসে না। কেহ আনে লাউ কুম্‌ড়ো পুঁইডাঁটা, কেহ বেগুণ কাঁচকলা থোড়। তখন অভয়া মূর্ত্তি, কেবল হাস্য এবং গল্পরস, এমন কি, অভয় পাইয়া নামাবলী গায় ঠাকুরটি যখন দাল-চালের খবর সুধাইতে আসেন তখন তাঁহাকে নথনাড়া সহিতে হয় না।

মূর্ত্তি প্রসন্নময়ী যখন ঠাকুরাণী শৌচাচার এবং জাতি-মহিমা ভুলিয়া যথার্থ দেবীর মত ছেলেদের, দুঃখীদের রোগ-শয্যাপার্শ্বে আসিয়া বসেন। রুগ্ন ছেলেটি বড় কাঁদিতেছে, মা পিসি কিছুতেই সাম্‌লাইতে পারিতেছে না—পুরুৎ ঠাকুরাণী আসিয়া কোলে লইলে সে একেবারে চুপ। লোকে বলে বুড়ি কি মোহিনী জানে—আমি কিন্তু জানি বুড়ি অনেক ছেলে-ভুলানো গল্প জানে। বুড়ি যে জিলিপি মিঠাই সন্দেশের গাছের গল্প করে, ছেলেরা জানে তার মানী যদি কেউ থাকে ত সে পুরুৎ ঠাকরুণ! এ বয়সে মিষ্টান্নের আর বড় ধার ধারি না, কিন্তু বুড়ির মিষ্ট মিষ্টি গল্পগুলি মনে পড়িলে ইচ্ছা হয় আবার তম্‌নি ছেলে বনিয়া যাই।

কত ছিটেফোঁটা মন্ত্রতন্ত্রই জানা আছে এই পুরুৎ ঠাকরুণ-[illegible]। শুনা যায় তাঁর মন্ত্রঃপূত শর্ষপ তৈলের প্রলেপে সে[illegible]লে চর্ম্মরোগ ত দেখা দেয়ই না—জলপড়ার মহিমায় পেঁচো মাম্‌দো প্রভৃতিও অন্তর্দ্ধান করিয়াছে। ঔষধ করাও তাঁর [illegible]ক্ষণ আসে। কিন্তু নাতী নাৎনী সম্বন্ধীয় দম্পতিগণের মিলন-[illegible]দনে ঠাকুরাণীর কর্ণমর্দ্দন ও মুষ্টিযোগে যেরূপ অভ্রান্ত [illegible]হস্ত তাতে ঔষধটা কতটা হস্তজ এবং কতটাই বা বলজ [illegible]বষয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে বিলক্ষণ মতভেদ আছে। বাসর[illegible]রুৎ ঠান্‌দিদির রঙ্গরস যে না দেখিল সে বুঝিতে পারিবে

না কেন ঠাকুরটি এখনও সে নথভূষিত বদনচন্দ্রের দিকে চাহিয়া চাহিয়া আত্মবিস্মৃত। আর যে বর তাঁর পদ্মহস্তের স্পর্শসুখ কর্ণপল্লবে অনুভব করিয়া অশ্রুপাতের বদলে ওষ্ঠে এবং দন্তে হাস্যরস সংগ্রহের চেষ্টা না করিয়াছে, জনশ্রুতি এই যে তাহাকে "দোজবরে" হইতেই হইবে।

পুরুষ মহলেও পুরোহিতানীর পসার কম নহে। অনেকেরই তিনি ঠান্‌দিদি—কিন্তু নাতীগণ সহসা তাঁকে ঘাঁটাইতে রাজি নন্। তাহার প্রধান কারণ, বাজে কথা ঠাকুরাণীটির ঠাট্টা-তামাসার বিষয়ীভূত নহে। পণ্ডিতা না হইলেও তাঁর বিদ্রূপে একটা "নৈতিক লক্ষ্য" থাকিত—অনেক বেচালের চাল তিনি বাক্যকশাঘাতে সংযত করাইয়াছেন। নিষ্কর্ম্মা আমোদপ্রিয় গ্রাম্য যুবকদের প্রায় সাড়ে পনেরো আনা ঠাকুরাণীদিদির ভয়ে তটস্থ। "অর্‌গুণ নেই বর্‌গুণ আছে" "বাইরে কোঁচার পত্তন ভিতরে ছুঁচোর কেত্তন" প্রভৃতি বাক্যবাণ তাঁর অমোঘ অস্ত্র—এবং লোকে বলে তিনিই তাহার রচয়িত্রী।

আতিথ্যে ঠাকুরাণী স্বয়ং অন্নপূর্ণা। বারো মাস তাঁর সে জন্য আয়োজন। দৈনিক বরাদ্দ চাল দালের ভিতর থেকে তিনি গোপনে চারি মুষ্টি সংগ্রহ করিয়া রাখেন। বাড়ির কুকুর বিড়ালকে পর্য্যন্ত আহার করাইয়া স্বয়ং আহারে প্রবৃত্ত হওয়ার অভ্যাস থাকিলেও মাসের মধ্যে বিশ দিন ঠাকুরাণীকে "ফলাহার" করিতে হয়। অভুক্ত অতিথিকে পানাহার দিতে তাঁর যে আনন্দ তার আর কি বলিব! তখন আর জাতিভেদ বড় থাকে না। শূদ্রকে পরিবেশন করিতে গিয়া বস্ত্র সম্বরণে কিঞ্চিৎ অতিরিক্ত সাবধান হইলেও, মনটার মধ্যে কোন ভেদাভেদ কেহ কখন লক্ষ্য করিতে পারে নাই।

পাল পার্ব্বণে এই অন্নপূর্ণা মূর্ত্তি আরও বিকশিত হইয়া উঠে। পৌষ পার্ব্বণে পিঠে পুলির দিনে পুরুৎবাড়িতে যে প্রসাদ পাইল না তাহার বৃথা জন্ম। তখন বিচিত্র আলিপানার রঞ্জিত সুঠাম আঙ্গিনায় ঠাকুরাণীকে সহস্রবার দৌড়াদৌড়ি করিতে দেখিয়া মনে হয় লক্ষ্মীর পদরেণু ধারণের জন্যই এ চিত্রবিদ্যার সৃষ্টি বটে।

পুরুৎঠাকরুণকে বৌ ঝি প্রণাম করিলেই তিনি স্মিতমুখে আশীর্ব্বাদ করেন "আমার মত পাকা মাথায় সিন্দূর পর বাছা!" এ কলিকালে কিন্তু সে আশীর্ব্বাদ বড় ফলে না।

সাহিত্যের প্রাণ।

একটি মাত্র গাছকে প্রকৃতি বলা যায় না। তেমনি কোন একটি মাত্র বর্ণনাকে যদি সাহিত্য বলে' ধর তা হলে আমার কথাটা বোঝানো শক্ত হয়ে দাঁড়ায়। বর্ণনা সাহিত্যের অন্তর্গত সন্দেহ নেই কিন্তু তার দ্বারা সাহিত্যকে সীমাবদ্ধ করা যায় না। একটি মাত্র সূর্য্যাস্ত বর্ণনার মধ্যে লেখকের জীবনাংশ এত অল্প থাকতে পারে, যে, হয় ত সেটুকু বোধগম্য হওয়া দুরূহ। কিন্তু উপরি-উপরি অনেকগুলি বর্ণনা দেখ্‌লে লেখকের মর্ম্মগত ভাবটুকু আমরা ধরতে পারতুম। আমরা বুঝ্‌তে পারতুম লেখক বাহ্য প্রকৃতির মধ্যে একটা আত্মার সংশ্রব দেখেন কি না; প্রকৃতিকে তিনি মানব-সংসারের চারিপার্শ্ববর্ত্তী দেয়ালের ছবির মত দেখেন, না, মানবসংসারকে এই প্রকাণ্ড রহস্যময়ী প্রকৃতির একান্তবর্ত্তীস্বরূপ দেখেন, কিম্বা মানবের সহিত প্রকৃতি মিলিত হয়ে, প্রাত্যহিক সহস্র নিকটসম্পর্কে বদ্ধ হয়ে, তাঁর সম্মুখে একটি বিশ্বব্যাপী গার্হস্থ্য দৃশ্য উপস্থিত করে।

সেই তত্ত্বটুকুকে জানানই যে সাহিত্যের উদ্দেশ্য তা' নয়, কিন্তু সে অলক্ষিত ভাবে আমাদের মনের উপর কার্য্য করে—কখনো বেশি সুখ দেয়, কখনো অল্প সুখ দেয়; কখন মনের মধ্যে একটা বৃহৎ বৈরাগ্যের আভাস আনে, কখন বা অনুরাগের প্রগাঢ় আনন্দ উদ্রেক করে। সন্ধ্যার বর্ণনায় কেবল যে সূর্য্যাস্তের আভা পড়ে তা' নয়, তার সঙ্গে লেখকের মানবহৃদয়ের আভা কখন ম্লান শ্রান্তির ভাবে, কখন গভীর শান্তির ভাবে, স্পষ্টতঃ অথবা অস্পষ্টতঃ মিশ্রিত থাকে এবং সেই আমাদের হৃদয়কে অনুরূপ ভাবে রঞ্জিত করে' তোলে। নতুবা, তুমি যে-রকম বর্ণনার কথা বলেছ সেরকম বর্ণনা ভাষায় অসম্ভব। ভাষা কখনই রেখাবর্ণময় চিত্রের মত অমিশ্র অবিকল প্রতিরূপ আমাদের সম্মুখে আনয়ন করতে পারে না।

বলা বাহুল্য, যেমন-তেমন লেখকের যেমন-তেমন বিশেষত্বই যে আমরা প্রার্থনীয় জ্ঞান করি তা নয়। মনে কর, পথ দিয়ে মস্ত একটা উৎসবের যাত্রা চলেচে। আমার এক বন্ধুর বারান্দা থেকে তার একটা অতি ক্ষুদ্র অংশ দেখ্‌তে পাই, আর এক বন্ধুর বারান্দা থেকে বৃহৎ অংশ এবং প্রধান অংশ দেখ্‌তে পাই—আর এক বন্ধু আছেন তাঁর দোতালায় উঠে যে দিক থেকেই দেখ্‌তে চেষ্টা করি কেবল তাঁর নিজের বারান্দাটুকুই দেখি। প্রত্যেক লোক আপন আপন বিশেষত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে জগতের এক একটা দৃশ্য দেখ্‌চে—কেউ বা বৃহৎভাবে দেখ্‌চে, কেউবা কেবল আপনাকেই দেখ্‌চে। যে আপনাকে ছাড়া আর কিছুই দেখাতে পারে না সাহিত্যের পক্ষে সে বাতায়নহীন অন্ধকার কারাগার মাত্র।

কিন্তু এ উপমায় আমার কথাটা পূরো বলা হল না, এবং

ঠিকটি বলা হল না। আমার প্রধান কথাটা এই—সাহিত্যের জগৎ মানেই হচ্চে মানুষের জীবনের সঙ্গে মিশ্রিত জগৎ। সূর্য্যাস্তকে তিন রকম ভাবে দেখা যাক্। বিজ্ঞানের সূর্য্যাস্ত, চিত্রের সূর্য্যাস্ত, এবং সাহিত্যের সূর্য্যাস্ত। বিজ্ঞানের সূর্য্যাস্ত হচ্চে, নিছক্ সূর্য্যাস্ত ঘটনাটি; চিত্রের সূর্য্যাস্ত হচ্চে কেবল সূর্য্যের অন্তর্দ্ধানমাত্র নয়, জলস্থলআকাশমেঘের সঙ্গে মিশ্রিত করে' সূর্য্যাস্ত দেখা; সাহিত্যের সূর্য্যাস্ত হচ্চে সেই জলস্থল-আকাশমেঘের মধ্যবর্ত্তী সূর্য্যাস্তকে মানুষের জীবনের উপর প্রতিফলিত করে' দেখা; কেবলমাত্র সূর্য্যাস্তের ফোটোগ্রাফ তোলা নয়, আমাদের মর্ম্মের সঙ্গে তাকে মিশ্রিত করে' প্রকাশ। যেমন, সমুদ্রের জলের উপর সন্ধ্যাকাশের প্রতিবিম্ব পড়ে' একটা অপরূপ সৌন্দর্য্যের উদ্ভব হয়, আকাশের উজ্জ্বল ছায়া জলের স্বচ্ছ তরলতার যোগে একটা নূতন ধর্ম্ম প্রাপ্ত হয়; তেম্নি জগতের প্রতিবিম্ব মানবের জীবনের মধ্যে পতিত হয়ে সেখান থেকে প্রাণ ও হৃদয়বৃত্তি লাভ করে। আমরা প্রকৃতিকে আমাদের নিজের সুখ দুঃখ আশা আকাঙ্খা দান করে' একটা নূতন কাণ্ড করে' তুলি; অভ্রভেদী জগৎসৌন্দর্য্যের মধ্যে একটা অমর প্রাণপ্রতিষ্ঠা করি; এবং তখনি সে সাহিত্যের উপযোগিতা প্রাপ্ত হয়।

প্রাকৃতিক দৃশ্যে দেখা যায়, সূর্য্যোদয় সূর্য্যাস্ত সর্ব্বত্র সমান বৈচিত্র্য ও বিকাশ লাভ করে না। বাঁশতলার পানাপুকুর সকল প্রকার আলোকে কেবল নিজেকেই প্রকাশ করে, তাও পরিষ্কার-রূপে নয়, নিতান্ত জটিল আবিল অপরিচ্ছন্নভাবে; তার এমন স্বচ্ছতা এমন উদারতা নেই যে, সমস্ত প্রভাতের আকাশকে সে আপনার মধ্যে নূতন ও নির্ম্মল করে' দেখাতে পারে।

সুইজর্‌ল্যাণ্ডের শৈলসরোবর-সম্বন্ধে আমার চেয়ে তোমার অভিজ্ঞতা বেশি আছে, অতএব তুমিই বল্‌তে পার সেখানকার উদয়াস্ত কিরকম অনির্ব্বচনীয় শোভাময়। মানুষের মধ্যেও সেইরকম আছে। বড় বড় লেখকেরা নিজের উদারতা অনুসারে সকল জিনিষকে এমন করে' প্রতিবিম্বিত করতে পারে যে তার কতখানি নিজের কতখানি বাহিরের কতখানি বিম্বের কতখানি প্রতিবিম্বের নির্দ্দিষ্টরূপে প্রভেদ করে' দেখানো কঠিন হয়। কিন্তু সঙ্কীর্ণ কুণো কল্পনা যাকেই প্রকাশ করতে চেষ্টা করুক না কেন নিজের বিশেষ আকৃতিটাকেই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাধান্য দিয়ে থাকে।

অতএব, লেখকের জীবনের মূলতত্ত্বটি যতই ব্যাপক হবে, মানবসমাজ এবং প্রকৃতির প্রকাণ্ড রহস্যকে যতই সে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধ সিদ্ধান্তে টুক্‌রো টুক্‌রো করে' না ভেঙ্গে ফেল্‌বে, আপনার জীবনের দশদিক্ উন্মুক্ত করে' নিখিলের সমগ্রতাকে আপনার অন্তরের মধ্যে আকর্ষণ করে' নিয়ে একটি বৃহৎ চেতনার সৃষ্টি করবে, ততই তার সাহিত্যের প্রকাণ্ড পরিধির মধ্যে তত্ত্বের কেন্দ্রবিন্দুটি অদৃশ্য হয়ে যাবে। সেই জন্যে মহৎ রচনার মধ্যে একটি বিশেষ মত একটি ক্ষুদ্র ঐক্য খুঁজে বা'র করা দায়; আমরা ক্ষুদ্র সমালোচকেরা নিজের ঘরগড়া মত দিয়ে যদি তাকে ঘিরতে চেষ্টা করি তা হলে পদে পদে তার মধ্যে স্বতোবিরোধ বেধে যায়। কিন্তু একটা অত্যন্ত দুর্গম কেন্দ্রস্থানে তার একটা বৃহৎ মীমাংসা বিরাজ করচে সেটি হচ্চে লেখকের মর্ম্মস্থান—অধিকাংশ স্থলেই লেখকের নিজের পক্ষেও [illegible]টি অনাবিষ্কৃত রাজ্য। শেক্সপীয়রের লেখার ভিতর থেকে [illegible]র একটা বিশেষত্ব খুঁজে বা'র করা কঠিন এই জন্যে, যে,

তাঁর সেটা অত্যন্ত বৃহৎ বিশেষত্ব। তিনি জীবনের যে মূলতত্ত্বটি আপনার অন্তরের মধ্যে সৃজন করে' তুলেচেন তাকে ছুটি চারটি সুসংলগ্ন মত-পাশ দিয়ে বন্ধ করা যায় না। এই জন্যে ভ্রম হয় তাঁর রচনার মধ্যে যেন একটি রচয়িতৃ-ঐক্য নেই।

কিন্তু সাহিত্যের মধ্যে সেইটে যে প্রত্যক্ষ ভাবে উপলব্ধি করা চাই আমি তা বলি নে—কিন্তু সে যে অন্তঃপুরলক্ষ্মীর মত অন্তরালে থেকে আমাদের হৃদয়ে হৃদয়ে সাহিত্যরস বিতরণ করবে তার আর সন্দেহ নেই।

যেমন করেই দেখি, আমরা মানুষকেই চাই; সাক্ষাৎ ভাবে, বা পরোক্ষ ভাবে। মানুষের সম্বন্ধে কাটাছেঁড়া তত্ত্ব চাই নে, মূল মানুষটিকেই চাই। তার হাসি চাই, তার কান্না চাই, তার অনুরাগ বিরাগ আমাদের হৃদয়ের পক্ষে রৌদ্রবৃষ্টির মত।

কিন্তু, এই হাসি কান্না অনুরাগ বিরাগ কোথা থেকে উঠ্‌চে! ফল্‌ষ্টাফ্ ও ডগ্‌বেরি থেকে আরম্ভ করে' লিয়র্ ও হ্যাম্‌লেট্ পর্য্যন্ত শেক্সপিয়র্ যে মানবলোক সৃষ্টি করেচেন, সেখানে মনুষ্যত্বের চিরস্থায়ী হাসিঅশ্রুর গভীর উৎসগুলি কারো অগোচর নেই। একটা সোসাইটি নভেলের প্রাত্যহিক কথাবার্ত্তা এবং খুচ্‌রো হাসিকান্নার চেয়ে আমরা শেক্সপিয়রের মধ্যে বেশি সত্য অনুভব করি। যদিচ সোসাইটি নভেলে যা বর্ণিত হয়েচে তা আমাদের প্রতিদিনের জীবনের অবিকল অনুরূপ চিত্র। কিন্তু আমরা জানি আজকের সোসাইটি নভেল কাল মিথ্যা হয়ে যাবে শেক্সপিয়র কখনো মিথ্যা হবে না। অতএব একটা সোসাইটি নভেল যতই চিত্রবিচিত্র করে' রচিত হোক্, তার ভাষা এবং রচনাকৌশল যতই সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ হোক্, শেক্সপিয়রের একটা নিকৃষ্ট নাটকের সঙ্গে তার তুলনা হয় না। সোসাইটি

নভেলে বর্ণিত প্রাত্যহিক সংসারের যথাযথ বর্ণনার অপেক্ষা শেক্সপিয়রে বর্ণিত প্রতিদিনদুর্লভ প্রবল হৃদয়াবেগের বর্ণনাকে আমরা কেন বেশি সত্য মনে করি সেইটে স্থির হলে সাহিত্যের সত্য কাকে বলা যায় পরিষ্কার বোঝা যাবে।

শেক্সপিয়রে আমরা চিরকালের মানুষ এবং আসল মানুষটিকে পাই, কেবল মুখের মানুষটি নয়। মানুষকে একেবারে তার শেষ পর্য্যন্ত আলোড়িত করে' শেক্সপিয়র তার সমস্ত মনুষ্যত্বকে অবারিত করে' দিয়েচেন। তার অশ্রুজল চোখের প্রান্তে ঈষৎ বিগলিত হয়ে রুমালের প্রান্তে শুষ্ক হচ্চে না, তার হাসি ওষ্ঠাধরকে ঈষৎ উদ্ভিন্ন করে' কেবল মুক্তাদন্তগুলিকে মাত্র বিকাশ করচে না—কিন্তু বিদীর্ণ প্রকৃতির নির্ঝরের মত অবাধে ঝরে' আসচে, উচ্ছ্বসিত প্রকৃতির ক্রীড়াশীল উৎসের মত প্রমোদে ফেটে পড়চে। তার মধ্যে একটা উচ্চ দর্শন-শিখর আছে যেখান থেকে মানবপ্রকৃতির সর্ব্বাপেক্ষা ব্যাপক দৃশ্য দৃষ্টিগোচর হয়।

গোটিয়ের গ্রন্থ সম্বন্ধে আমি যা বলেছিলুম সে হচ্চে ঠিক এর বিপরীত। গোটিয়ে যেখানে তাঁর রচনার মূল পত্তন করেচেন সেখান থেকে আমরা জগতের চিরস্থায়ী সত্য দেখ্‌তে পাইনে। যে সৌন্দর্য্য মানুষের ভালবাসার মধ্যে চিরকাল বদ্ধমূল, যার শ্রান্তি নেই, তৃপ্তি নেই, যে সৌন্দর্য্য ভালবাসার লোকের মুখ থেকে প্রতিফলিত হয়ে জগতের অনন্ত গোপন সৌন্দর্য্যকে অবারিত করে' দেয়—মানুষ চিরকাল যে সৌন্দর্য্যের কোলে মানুষ হয়ে উঠ্‌চে, তার মধ্যে আমাদের স্থাপন না করে' তিনি আমাদের একটা ক্ষণিক মায়ামরীচিকার মধ্যে নিয়ে গেছেন; সে মরীচিকা যতই সম্পূর্ণ ও সুনিপুণ হোক্ ব্যাপক নয়, স্থায়ী নয়, এই জন্যই সত্য নয়। সত্য নয় ঠিক নয়, অল্প সত্য। অর্থাৎ,

সেটা একরকম বিশেষ প্রকৃতির বিশেষ লোকের বিশেষ অবস্থার পক্ষে সত্য, তার বাইরে তার আমল নেই। অতএব, মনুষ্যত্বের যতটা বেশি অংশ অধিকার করতে পারবে, সাহিত্যের সত্য ততটা বেশি বেড়ে যাবে।

কিন্তু অনেকে বলেন, সাহিত্যে কেবল একমাত্র সত্য আছে সেটা হচ্চে প্রকাশের সত্য। অর্থাৎ যেটি ব্যক্ত করতে চাই সেটি প্রকাশ করবার উপায়গুলি অযথা হলেই সেটা মিথ্যা হল, এবং যথাযথ হলেই সত্য হল।

এক হিসাবে কথাটা ঠিক। প্রকাশটাই হচ্চে সাহিত্যের প্রথম সত্য। কিন্তু ঐটেই কি শেষ সত্য?

জীবরাজ্যের প্রথম সত্য হচ্চে প্রটোপ্ল্যাজ্‌ম্, কিন্তু শেষ সত্য মানুষ। প্রটোপ্ল্যাজ্‌ম্ মানুষের মধ্যে আছে কিন্তু মানুষ প্রটোপ্ল্যাজ্‌মের মধ্যে নেই। এখন, এক হিসাবে প্রটোপ্ল্যাজ্‌মকে জীবের আদর্শ বলা যেতে পারে, এক হিসাবে মানুষকে জীবের আদর্শ বলা যায়।

সাহিত্যের আদিম সত্য হচ্চে প্রকাশ মাত্র, কিন্তু তার পরিণাম-সত্য হচ্চে ইন্দ্রিয় মন এবং আত্মার সমষ্টিগত মানুষকে প্রকাশ। ছেলেভুলানো ছড়া থেকে শেক্সপিয়রের কাব্যের উৎপত্তি। এখন আমরা আদিম আদর্শকে দিয়ে সাহিত্যের বিচার করিনে, পরিণাম-আদর্শ দিয়েই তার বিচার করি। এখন আমরা কেবল দেখিনে প্রকাশ পেলে কি না, দেখি, কতখানি প্রকাশ পেলে। দেখি, যেটুকু প্রকাশ পেয়েচে তাতে কেবল আমাদের ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি হয়, না, ইন্দ্রিয় এবং বুদ্ধির তৃপ্তি হয়, না, ইন্দ্রিয় বুদ্ধি এবং হৃদয়ের তৃপ্তি হয়। সেই অনুসারে আমরা বলি অমুক লেখায় বেশি অথবা অল্প সত্য আছে। কিন্তু এটা

স্বীকার্য্য, যে, প্রকাশ পাওয়াটা সাহিত্যমাত্রেরই প্রথম এবং প্রধান আবশ্যক। বরঞ্চ ভাবের গৌরব না থাকলেও সাহিত্য হয় কিন্তু প্রকাশ না পেলে সাহিত্য হয় না। বরঞ্চ মুড়ো গাছও গাছ কিন্তু বীজ গাছ নয়।

আমার পূর্ব্বপত্রে এ কথাটাকে বোধ হয় তেমন আমল দিই নি। তোমার প্রতিবাদেই আমার সমস্ত কথা ক্রমে একটা আকার ধারণ করে' দেখা দিচ্চে।

কিন্তু যতই আলোচনা করচি ততই অধিক অনুভব করচি যে, সমগ্র মানবকে প্রকাশের চেষ্টাই সাহিত্যের প্রাণ। তাই তুমি যদি একটা টুক্‌রো সাহিত্য তুলে নিয়ে বল, এর মধ্যে সমস্ত মানুষ কোথা তবে আমি নিরুত্তর। কিন্তু সাহিত্যের অধিকার যতদূর আছে সবটা যদি আলোচনা করে' দেখ, তা হলে আমার সঙ্গে তোমার কোন অনৈক্য হবে না। মানুষের প্রবাহ হুহু করে' চলে যাচ্চে; তার সমস্ত সুখ দুঃখ আশা আকাঙ্ক্ষা, তার সমস্ত জীবনের সমষ্টি আর কোথাও থাক্‌চে না কেবল সাহিত্যে থাক্‌চে। সঙ্গীতে চিত্রে বিজ্ঞানে দর্শনে সমস্ত মানুষ নেই। এই জন্যই সাহিত্যের এত আদর। এই জন্যই সাহিত্য সর্ব্বদেশের মনুষ্যত্বের অক্ষয় ভাণ্ডার। এই জন্যেই প্রত্যেক জাতি আপন আপন সাহিত্যকে এত বেশি অনুরাগ ও গর্ব্বের সহিত রক্ষা করে।

আমার এক একবার আশঙ্কা হচ্চে তুমি আমার উপর চটে' উঠবে—বল্‌বে, লোকটাকে কিছুতেই তর্কের লক্ষ্যস্থলে আনা যায় না। আমি বাড়িয়ে কমিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কেবল নিজের মতটাকে নানা রকম করে' বল্‌বার চেষ্টা করচি; প্রত্যেক পুনরুক্তিতে পূর্ব্বের কথা কতকটা সম্মার্জ্জন পরিবর্ত্তন করে' চলা

যাচ্ছে—তাতে তর্কের লক্ষ্য স্থির রাখা তোমার পক্ষে শক্ত হয়ে দাঁড়াচ্চে। কিন্তু তুমি পূর্ব্ব হতেই জান, খণ্ড খণ্ড ভাবে তর্ক করা আমার কাজ নয়। সমস্ত মোট কথাটা গুছিয়ে না উঠ্‌তে পারলে আমি জোর পাইনে। মাঝে মাঝে সুতীক্ষ্ণ সমালোচনায় তুমি যেখানটা ছিন্ন করচ সেখানকার জীর্ণতা সেরে নিয়ে দ্বিতীয়বার আগাগোড়া ফেঁদে দাঁড়াতে হচ্চে।—তার উপরে আবার উপমার জ্বালায় তুমি বোধ হয় অস্থির হয়ে উঠেছ। কিন্তু আমার এ প্রাচীন রোগটিও তোমার জানা আছে। মনের কোন একটা ভাব ব্যক্ত করবার ব্যাকুলতা জন্মালে আমার মন সেগুলোকে উপমার প্রতিমাকারে সাজিয়ে পাঠায়—অনেকটা বকাবকি বাঁচিয়ে দেয়। অক্ষরের পরিবর্ত্তে হাইরোগ্লিফিক্স্ ব্যবহারের মত। কিন্তু এরকম রচনা-প্রণালী অত্যন্ত বহুকেলে; মনের কথাকে সাক্ষাৎভাবে ব্যক্ত না করে' প্রতিনিধি দ্বারা ব্যক্ত করা। এ রকম করলে যুক্তিসংসারের আদানপ্রদান পরিষ্কাররূপে চালানো অসম্ভব হয়ে ওঠে। যা হোক্, আগে থাক্‌তে দোষ স্বীকার করচি তাতে যদি তোমার মনস্তুষ্টি হয়।

তুমি লিখেচ, আমার সঙ্গে এ তর্ক তুমি মোকাবিলায় চোকাতে চাও। তা হলে আমার পক্ষে ভারি মুস্কিল। তা হলে কেবল টুক্‌রো নিয়েই তর্ক হয়, মোট কথাটা আজ থেকে মৃত্যু-কাল পর্য্যন্ত তোমাকে বোঝাতে পারি নে। নিজের অধিকাংশ মতের সঙ্গে নিজের প্রত্যক্ষ পরিচয় থাকে না। তারা যদিচ আমার আচারে ব্যবহারে লেখায় নিজের কাজ নিজে করে' যায় কিন্তু আমি কি সকল সময়ে তাদের খোঁজ রাখি? এই জন্যে তর্ক উপস্থিত হলে বিনা নুটিশে অকস্মাৎ কাউকে ডাক্ দিয়ে

সাম্‌নে তলব করতে পারিনে—নামও জানিনে, চেহারাও চিনিও নে। লেখবার একটা সুবিধে এই যে, আপনার মতের সঙ্গে পরিচিত হবার একটা অবসর পাওয়া যায়, লেখার সঙ্গে সঙ্গে অমনি নিজের মতটাকে যেন স্পর্শ দ্বারা অনুভব করে' যাওয়া যায়—নিজের সঙ্গে নিজের নূতন পরিচয়ে প্রতি পদে একটা নূতন আনন্দ পাওয়া যায়, এবং সেই উৎসাহে লেখা এগোতে থাকে। সেই নূতন আনন্দের আবেগে লেখা অনেক সময় জীবন্ত ও সরস হয়। কিন্তু তার একটা অসুবিধাও আছে। কাঁচা পরিচয়ে পাকা কথা বলা যায় না। তেমন চেপে ধরলে ক্রমে কথার একটু আধটু পরিবর্ত্তন করতে হয়। চিঠিতে আস্তে আস্তে সেই পরিবর্ত্তন করবার সুবিধা আছে। প্রতিবাদীর মুখের সাম্‌নে মতিস্থির থাকে না এবং অত্যন্ত জিদ্‌ বেড়ে যায়। অতএব মুখোমুখী না করে' কলমে কলমেই ভাল।

ধর্ম্মজঙ্গল।

নব্য হিন্দুর এক প্রধান সমস্যা ধর্ম্ম। এক দিকে পুরাতন শাস্ত্রবিধি—নানা মুনির নানা মত, নানা গুরুর নানান্‌ টীকা, ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের নানা সময়ের স্তূপাকার বিধি এবং বিধানের দুর্ভেদ্য রহস্য; একদিকে প্রচলিত লোকাচার—হিঁদুয়ানির সহস্র নির্দ্দিষ্ট এবং অনির্দ্দিষ্ট অনুষ্ঠান, খাওয়া পরা শোওয়া বসা, ওঠা নামা, হাঁচি কাশির বিবিধ উপদ্রব; আর একদিকে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার নূতন জ্ঞানালোকে নূতন ভাব, নূতন বিশ্বাস এবং নূতন কর্ত্তব্যের উত্তেজনা। এই তিনের

মধ্যে সর্ব্বাঙ্গীন সামঞ্জস্য রক্ষা করা মহা দায়। ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্র ভিন্ন ভিন্ন পথ অবলম্বন করিতে পরামর্শ দেয়, লোকাচার আবার স্বতন্ত্র বিধান জারি করে, এবং ইংরাজী শিক্ষা যে পথ নির্দ্দেশ করে তাহা অনেক সময়েই লোকাচারের বিশেষ বিরোধী এবং শাস্ত্রকেও যে সর্ব্বত্র সম্যক্ রক্ষা করিয়া চলে এমন বলা যায় না। সুতরাং নব্য হিন্দুর অবস্থা নিতান্ত শোচনীয়। শিক্ষাগুণে তিনি পাশ্চাত্য ভাবে দীক্ষিত, সমাজের ভয়ে লোকাচার পালন করেন এবং তর্কস্থলে কেবল আর্য্যমর্য্যাদা বজায় রাখিবার জন্য জানাশুনা বচন পাইলে তাহা লইয়া সঘনে মুখনাড়া দেন। কতটুকু কি মানিলে এবং কতটুকু কি করিলে হিন্দুধর্ম্ম অক্ষুণ্ণ পালন করা হয় এবিষয়ে তাঁহার জ্ঞানকাণ্ড বিধর্ম্মীরই মত।

সে জন্য কিন্তু নব্য হিন্দুকে দোষ দেওয়া চলে না। কি করিলে না করিলে হিন্দুধর্ম্ম পালন কিম্বা লঙ্ঘন করা হয় বলা বাস্তবিকই বড় শক্ত। মুসলমান কিম্বা খৃষ্টধর্ম্ম যেরূপ জাতি-বর্ণনির্ব্বিশেষে কতকগুলি মূল বীজে বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে এবং আনুষঙ্গিক কতকগুলি অনুষ্ঠানের সহিত জড়িত, হিন্দুধর্ম্ম সেরূপ নহে। ঈশ্বরে বিশ্বাস এবং মহম্মদকে ঈশ্বরের প্রেরিত বলিয়া স্বীকার করাই মুসলমান ধর্ম্মের বীজমন্ত্র; যীশুকে ঈশ্বরের পুত্র ও মানবের পরিত্রাতারূপে গ্রহণ করার উপরেই খৃষ্টধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা; হিন্দুধর্ম্মে বিশ্বাসের এরূপ কোনও নির্দ্দিষ্ট ভিত্তি নাই। নানাবিধ সম্পূর্ণ বিভিন্ন এবং বিরোধী মত ও বিশ্বাস, আচার অনুষ্ঠান, কাব্য দর্শন বিজ্ঞান জ্যোতিষ মন্ত্রতন্ত্র ইন্দ্রজাল যাহা কিছু কোন কালে এদেশে উদ্ভূত হইয়াছে কিম্বা বিদেশ হইতে আসিয়া কালক্রমে এদেশী হইয়া দাঁড়াইয়াছে তাহাই নিঃশব্দে হিন্দুধর্ম্মের অঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছে। ইহার

কতটা বিশেষ কোন ধর্ম্মমতে বিশ্বাস, কতটা লোকাচার, কতটা শাস্ত্রপালন, কতটা জাতিভেদ আহার বিহার সম্বন্ধে সমাজের নিয়মরক্ষা, আর কতটাই বা ব্যক্তির স্বাধীনতা এ পর্য্যন্ত তাহা সুনির্দ্দিষ্ট হয় নাই।

হিন্দুধর্ম্মের যদি কোন বিশেষত্ব চোখে পড়ে ত তাহা কেবল কোনপ্রকার শৃঙ্খলা, প্রণালী এবং গঠনের সম্পূর্ণ অভাব। জ্ঞানে অজ্ঞানে, সত্য মিথ্যায়, ব্রহ্মে মৃৎপিণ্ডে, দেবতা পিশাচে, প্রেমে হিংসায় এরূপ নির্ব্বিবাদ একান্নবর্ত্তিতা আর কোথাও দেখা যায় না। আস্তিক্য এবং নিরীশ্বরবাদ, বিশ্বাস এবং সন্দেহ, কর্ম্ম এবং আলস্যের মধ্যে কোনরূপ ব্যবধান নাই। চার্ব্বাকের শিষ্যত্ব স্বীকারপূর্ব্বক ঈশ্বর ও পরকাল হইতে পরাঙ্মুখ হইয়া যে ব্যক্তি সমস্ত ধর্ম্মনীতিকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখে সেও যেমন হিন্দু, আর যে ব্যক্তি ঈশ্বরের নাম না লইয়া জলগ্রহণ করে না সেও সেইরূপ হিন্দু। ব্রহ্ম যাহার আরাধ্য দেবতা এবং তেত্রিশ কোটি উপ ও অপদেবতা যাহার সম্বল দুই জনেই হিন্দুধর্ম্মের সমান সেবক। বিধানও তেমনি;—একদিকে অহিংসার পর ধর্ম্ম নাই, আর একদিকে বলি নহিলে দেবপূজা হয় না—বলি ছাগ হইতে আরম্ভ করিয়া মানুষ অবধি। সুতরাং কি যে হিন্দু-ধর্ম্মের অনুমোদিত এবং কি নয় তাহা ঠাহরান দায়। ভয়ে ভয়ে কথা কহিতে হয়, কাহাকে হিন্দু নয় বলিলে লাইবেল এবং কাহাকে হিন্দু বলিলে লাইবেল হইয়া দাঁড়ায়।

অধিকারীভেদের ব্যবস্থা এখানে খাটে না। অর্থাৎ এ কথা বলা চলে না যে, হিন্দুধর্ম্মের একটি মূল মত ও বিশ্বাস আছে—তবে সর্ব্বসাধারণে সে উচ্চ ভাব সম্যক্ ধারনা করিতে পারে না বলিয়া নানা দিক দিয়া সেই আদর্শে লইয়া যাওয়া হয়।

দুই সম্পূর্ণ বিরোধী মতের গতি বিপরীত দিকেই হইয়া থাকে। নিরীশ্বরবাদের মধ্য দিয়া ব্রহ্মজ্ঞানের পথ নহে এবং দেবোদ্দেশে ক্রমাগত জীবহিংসা করিয়া অহিংসা সাধন হয় না। অতএব স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, হিন্দুধর্ম্মের কোনও নির্দ্দিষ্ট মূল মত বা বিশ্বাস নাই। ঋষিরা নিজে নিজে স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতেন—তাঁহারা সেই সকল চিন্তা রাখিয়া গিয়াছেন, বলপূর্ব্বক সব ঋষিকে এক গণ্ডীর মধ্যে আনা যায় না। পরবর্ত্তী ব্রাহ্মণেরাও তখনকার সুবিধামত যে সকল বিধিব্যবস্থা করিয়াছেন যাবতীয় প্রাচীন ঋষিবাক্যের সহিত তাহার ঐক্য হইবার কথা নয়। তখন হিন্দুধর্ম্ম বলিয়া কোনো কিছু ছিল না—এবং পরে পরে পাঁচ জনে সেই নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্মের ব্যাখ্যাও করেন নাই।

কেবলি যে কোনও মূল ধর্ম্মমত কিম্বা বিশ্বাসের কোনরূপ আঁটাআঁটি নাই তাহা নয়, আমাদের আচার ব্যবহার সম্বন্ধেও ভিন্ন ভিন্ন জাতি বর্ণ শ্রেণী এবং সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্পূর্ণ অনৈক্য। গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ মাংসাশী, পশ্চিমী ব্রাহ্মণের আমিষসংস্পর্শ নিষিদ্ধ এবং এ নিষেধ অবহেলা করিলে অবিলম্বে জাতিচ্যুত হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে। দাক্ষিণাত্যে অনেক ব্রাহ্মণ পলাণ্ডু ভক্ষণ করিয়া থাকেন এবং বাঙ্গলার শক্তিউপাসকদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণের পানদোষদৃষ্টান্তও বিরল নহে, কিন্তু পলাণ্ডুভক্ষণ কিম্বা মদ্যপানে হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণের সদ্য জাতিনাশ হয়। বঙ্গদেশ ভিন্ন অন্যান্য অনেক প্রদেশে ব্রাহ্মণেতর জাতির মধ্যে বিধবাবিবাহ প্রচলিত এবং নিম্নশ্রেণীর মধ্যে দাম্পত্য ছিন্ন করিয়া পত্যন্তরগ্রহণও বিরল নহে। ইহা ভিন্ন নানা বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈব প্রভৃতি সম্প্রদায়ের নানাবিধ অনুষ্ঠান—কোনটির সহিত কোনটির বড় মিল নাই। এ সকল আচার-

ভেদকে নিতান্ত সামান্য বলিয়া গণ্য করা যায় না, কারণ, এই আচারভেদ হইতেই পরস্পরের মধ্যে আহারব্যবহার আদান-প্রদান সম্বন্ধে যত বাধা এবং সকল প্রকার আত্মীয়তার পথ একে-বারে বন্ধ।

কিন্তু আদানপ্রদানের পথ বন্ধ কেবলি কি আচারভেদ নিবন্ধন? না, জাতিবৈরী, গ্রাম্য দলাদলি এবং অন্যান্য আরও অনেক কারণ আছে? রাঢ়ী বারেন্দ্র, কুলীন বংশজ, ফুলমেল হেন-তেন এ সকলেও ত আমাদিগকে পরস্পর হইতে যথেষ্ট বিচ্ছিন্ন করিয়াছে। ইহা এ দেশের মাটির গুণ বলিতে হইবে। হিন্দুধর্ম্ম একদিকে যেমন ঢিলেঢালা আল্‌গা—মত ও বিশ্বাসের বাঁধাবাঁধি নাই, বিরোধী অনুশাসন এবং আইনকানুনের মধ্যে ভেদাভেদ নাই, কেবলি শাস্ত্রে অশাস্ত্রে লোকাচারে অনাচারে গোঁজামিল; আর একদিকে তেমনি বজ্রআঁটুনি, স্তরে স্তরে নানারকমের জাতিভেদ—ব্রাহ্মণ শূদ্রে, শূদ্রে শূদ্রে, ব্রাহ্মণে ব্রাহ্মণে, জাতিতে জাতিতে, বর্ণে বর্ণে, কুলে কুলে, জ্ঞাতিতে জ্ঞাতিতে এবং ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে। মুসলমান অথবা খৃষ্টান ধর্ম্ম যেমন বিচ্ছিন্ন মানবজাতিকে এক বৃহৎ মণ্ডলীর মধ্যে আনিয়া এক করিয়া ফেলিতে চায়, হিন্দুধর্ম্মের প্রকৃতি সেরূপ নহে। মণ্ডলীগঠন হিন্দুধর্ম্মের প্রকৃতিবিরুদ্ধ এবং ভেদবুদ্ধি ইহার স্বাভাবিক।

প্রচার ত হিন্দুধর্ম্মের ভাব নয়, সুতরাং মণ্ডলীগঠনের আমাদের আবশ্যকও হয় নাই। আর দেশব্যাপী সুবৃহৎ এক ধর্ম্মমণ্ডলী সংস্থাপনের পক্ষে আমাদের কতকগুলি বাধাও ছিল। ভারতবর্ষ চিরদিনই সহস্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য উপরাজ্যে বিভক্ত ছিল। প্রত্যেক বিভাগ অপরের প্রতিদ্বন্দ্বী। নিত্য ঝগড়া

বিবাদ যুদ্ধহাঙ্গামা লাগিয়াই আছে। এ অবস্থায় একটা রীতিমত ধর্ম্মগঠন অসম্ভব। তবে এখন যে আমরা প্রাচীন হিন্দুধর্ম্মের নাম লইয়া পড়িয়াছি সে অনেকটা আমাদের মন-গড়া—ইংরাজ শাসন ও ইংরাজী শিক্ষার প্রসাদে আমাদের মনে সকল বিষয়ে যে একটি প্রণালীবদ্ধ বৃহৎ সংহত ঐক্যের ভাব আসিয়াছে প্রাচীনকালের সমাজ ও ধর্ম্মে এই ভাব আরোপ করিয়া একটি মানসী প্রতিমূর্ত্তি খাড়া করিয়া তুলিতেছি মাত্র। এবং নব্য হিন্দুধর্ম্মকে এই মানসী প্রাচীনেরই বংশধর ঠাহরাইয়া সান্ত্বনা লাভ করিতেছি যেন সমস্ত ভারতবর্ষ এক-ধর্ম্ম, এক-মত, এক-বিশ্বাস—এবং এই বিপুল জনসমাজ যে ধর্ম্মবন্ধনে পরিচালিত তাহাকেই হিন্দুধর্ম্ম বলা হয়।

কিন্তু এ পর্য্যন্ত ত আমাদের যাহা কিছু ঐক্য ঐ যাবনিক হিন্দু নামটায়। হিন্দু বলিলে আমরা প্রথমতঃ ভারতবাসী বলিয়া বুঝি, দ্বিতীয়তঃ মুসলমান খৃষ্টান প্রভৃতি ধর্ম্মাবলম্বী নয় বলিয়া জানি, তৃতীয়তঃ পিতামাতা যে হিন্দু তাহার পরিচয় পাই। মনের এক কোণে জাতিভেদের একটু ছায়াও আসিয়া পড়ে। এবং ব্রাহ্মণ্যের সহস্র বিরোধী বিধানের মধ্যে যে কোন গুটিকতকের প্রভাব অনুমান করি। কিন্তু জাতিভেদ এবং ব্রাহ্মণ্যের বিরুদ্ধে প্রাচীনকালে মধ্যে মধ্যে যে সকল ধর্ম্মান্দোলন গিয়াছে তাহাও এখন হিন্দুধর্ম্মেরই অঙ্গ বলিয়া পরিগণিত হয় এবং চৈতন্য প্রভৃতি সংস্কারকেরা অবতারের মত সম্মানিত হয়েন। এমন কি, যে বুদ্ধদেবের প্রভাবে ভারতবর্ষের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সমস্ত ব্রহ্মণ্য একেবারে নির্ব্বিষ হইয়া পড়িয়াছিল এবং সমস্ত জাত্যভিমান ও মিথ্যা দম্ভ চূর্ণ হইয়া গিয়াছিল সে বুদ্ধদেবও আমাদের একজন অবতার মধ্যে গণ্য। শুধু তাই

নয়। জগন্নাথক্ষেত্রে ব্রাহ্মণে চণ্ডালে উচ্চনীচে ভেদ নাই—যে ব্রাহ্মণ শূদ্রের ছায়া মাড়াইয়া স্নান না করিলে আপনাকে পতিত বলিয়া ঠিক দিয়া রাখেন, শূদ্রের অন্নগ্রহণ করিয়াও সেখানে তাঁহার ব্রহ্মণ্য ক্ষুণ্ণ হয় না।

এ সকল ছিদ্র থাকিলেও কিন্তু জাতিভেদ যে আমাদের মজ্জায় মজ্জায় তাহাতে আর সন্দেহ নাই। একজন মহৎ লোকের আবির্ভাবে চারিদিকে যখন একটু উৎসাহ উদ্যমের সঞ্চার হয় তখনই দিনকতক এখানে জাতি ভাঙ্গে সেখানে শ্রেণী ভাঙ্গে, একটা হৈচৈ বাধে, তাহার পর আবার যে-কে-সেই। বুদ্ধই আসুন আর চৈতন্যই আসুন চোখের আড়াল হইলেই আমাদের প্রাণের আড়াল। আমাদের যাহা কিছু সম্পর্ক শরীরী মানুষটির সহিত, আমরা ভাবের ধার ধারি না। তাই মহত্বকে কেবল অবতার হিসাবে ফুলচন্দন দিয়া পূজা করি এবং কার্য্যতঃ যথাসাধ্য তাঁহার প্রতিকূলাচরণ করিতে ত্রুটি করি না। চৈতন্যের শিষ্যেরা তাঁহার অনুসরণ করে তাঁহাকে মারিয়া—তিনি যে সার্ব্বজনীন উদার প্রেম প্রচার করিয়াছিলেন সেই প্রেম সঙ্কীর্ণ গণ্ডীবদ্ধ করিয়া, তিনি যে মধুর রসে জগতের হৃদয় সিক্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন সেই বিমল রসে বিষ মিশাইয়া। বুদ্ধ অবতারীকৃত—কিন্তু যে মহদ্ভাবে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা সে ভাবকে আমরা দেশান্তরিত করিয়া নিশ্চিন্ত। এবং আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, অবতার বলিয়া গণ্য করিলেও বুদ্ধকে আমরা নাস্তিক বলিয়া গালি দিতে ছাড়ি না। এরূপ দেবে দানবে—অবতারে নিরীশ্বরে অপূর্ব্ব সম্মিলন একমাত্র আমাদের দেশেই সম্ভব।

আসল কথা, ভেদসংঘটন আমাদের জাতীয় চরিত্রের একটি

বিশেষ লক্ষণ। এবং সেই জন্যই জাতিভেদ আমাদের ধর্ম্মের সহিত এমন জড়িত হইয়া গিয়াছে। সমাজের সর্ব্বাঙ্গের মধ্যে রক্তচলাচল বন্ধ। পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার দিকে আমাদের যত ঝোঁক। দেবতা তেত্রিশ কোটি এবং ইহার উপরে প্রতিদিন দু' দশটি করিয়া বাড়িতেছেন। ভিন্ন ভিন্ন দেবতার সেবকদিগের মধ্যে দলাদলি। শৈব বৈষ্ণব দেবতার নামে ছড়া বাঁধিয়া গালি দেয়, বৈষ্ণব খুঁজিয়া খুঁজিয়া শিবের যত অপকর্ম্ম বাহির করে, আবার শাক্ত শৈবের মধ্যেও বনিবনাও হয় না। যাঁহারা কবিকঙ্কণ চণ্ডী পাঠ করিয়াছেন, স্ত্রীদেবতার প্রতি ধনপতি সওদাগরের বিরাগের কথা তাঁহাদের অবিদিত নাই। আবার ছোটখাট অনেক অজ্ঞাতকুলশীল দেবতা আছেন, ভক্তেরা স্তুতি রচনা করিয়া তাঁহাদিগকে জাগ্রত করিয়া তুলে। এবং এরূপ অনেক প্রমাণ প্রয়োগ দেখা যায় যে, মনস্কামনা সিদ্ধিপক্ষে সত্যপীর, ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু বরুণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং মনসা দেবী অনায়াসে মহেশ্বরকে লঙ্ঘন করিয়া যাহাকে তাহাকে কালিন্দীসহোদরসদনে চালান দিতে পারেন। ইহা ভিন্ন, গ্রামে গ্রামে পাড়ায় পাড়ায় ভিন্ন ভিন্ন জাগ্রত দেবতার পরিচয় শুনা যায়। গ্রামের লোকেরা অনেক বুদ্ধিপূর্ব্বক ইহাঁদিগকে সন্ধান করিয়া বাহির করে। ও-পাড়ায় মনু বুড়ী এতদিন বাঁচিয়া বাঁচিয়া একানব্বই বৎসর বয়সে যেই ইহলীলা সাঙ্গ করিল, বৎসর না যাইতে এ-পাড়ার নবীন ঘোষের গৃহিণী পুত্রশোকের মর্ম্মঘাতী বেদনা অনুভব করিলেন; লোকে সন্ধান পাইল মনু বুড়ী নিতান্ত যে-সে নয়, নবীন ঘোষের বাড়ীর ঈশান কোণে আমড়াতলায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে, আমড়াবনের পাশে পুকুরপাড়ে ওলাদেবীর বাস, মনু ওলাদেবীর কেহ হয়।

অতএব ওলাদেবীর মত মনু বুড়ীরও সেবার বিধানাদি করিয়া দিয়া তাহাকে সন্তুষ্ট রাখিতে হইবে। এইরূপে মনুঠাকুরাণী ওলা মনসার দল বৃদ্ধি করিলেন। জেনেরাল নিকলসন সিপাহী-দের বড় প্রিয়পাত্র ছিলেন—তাহারা তাঁহাকে দেবতা করিয়া তুলিল। আর সন্ন্যাসী ফকির মানুষের দেবত্বপ্রাপ্তি ত নিত্য ঘটনা। এইরূপে পুরাতন ও নূতন দেবদেবীতে আর স্থান সং-কুলান হয় না। দেবতাদিগের মধ্যেও নানা জাতি এবং বর্ণ—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, গোয়ালা, এমন কি, কদাচ কখনো মুসলমান এবং খৃষ্টান পর্য্যন্ত। এইখানে বলা ভাল, বিড়াল কুকুর প্রভৃতি জন্তুরূপী দেবতারও মধ্যে মধ্যে নাম শুনা যায়। এবং অনেক সময় ভূতপ্রেত হইতে এই সকল দেবতার অভিব্যক্তি।

ব্রাহ্মণেরা যে সকল সময় এই সকল দেবতাকে খোঁজ করিয়া বাহির করেন তাহা নয়—দেবতার আবির্ভাব কখন্ কোথায় হয় বলা ত যায় না—তিনি যাহার প্রতি প্রসন্ন হন, তা' ভূতো বাগ্‌দীই কে জানে আর হারু চণ্ডালই বা কে জানে! তবে ঘণ্টা নাড়িবার বেলায় একটা ব্রাহ্মণ চাই বটে। কারণ, শূদ্রসংস্পর্শে দেবতার দেবত্বনাশ হইতে আটক নাই। বলা বাহুল্য, ব্রাহ্মণ জুটিতে বিলম্ব হয় না। এবং ঘণ্টানাড়া ব্রাহ্মণ ভিন্ন শাস্ত্রীয় পণ্ডিতেরাও এই অনার্য্য দেবতার চরণে ফুলচন্দন ও একটি করিয়া প্রণাম পাঠাইয়া ধন্য হয়েন।

অনার্য্য দেবতা বলিলাম বলিয়া এখানে হয়ত কৈফিয়ৎ দেওয়া আবশ্যক। কারণ, হিন্দুধর্ম্মকে অনেকে সম্পূর্ণ আর্য্য বলিয়া মনে করেন এবং ব্রাহ্মণধর্ম্মের সহিত ইহাকে এক ঠাহ-রান। কিন্তু হিন্দু এবং আর্য্যে অনেক তফাৎ। আর্য্য বলিতে কেবল সমাজের উচ্চশ্রেণীকেই বুঝায়—ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য;

হিন্দু আর্য্যে অনার্য্যে, উচ্চ নীচে,নানা বিরোধী জিনিষের সম্মিশ্রণের ফল। হিন্দু কেবলি ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ে আবদ্ধ নয়, হাড়ি বাগ্‌দী ডোম চামার ভারতের অধিবাসী যে কেহ স্পষ্টতঃ মুসলমান কিম্বা খৃষ্টান নয় সেই হিন্দু। এবং ইহাদের সকলেরই ধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মের অন্তর্ভুক্ত। সমাজে ব্রাহ্মণের প্রাধান্য হইলেও হিন্দুধর্ম্মগঠনে এই সকল নানাবিধ নিরক্ষর লোকদিগের কল্পনার কম প্রভাব নহে। এবং সে প্রভাব উন্নত ব্রাহ্মণদিগকেও স্পর্শ করিয়াছে। মাঝিমাল্লারা বিপদ্‌ নিবারণের জন্য বিশালাক্ষির দহে পয়সা ফেলিয়া দেয়। দেখাদেখি ব্রাহ্মণেরাও নৌকা করিয়া যাইবার সময় উক্ত স্থানে বিশালাক্ষি দেবীর উদ্দেশে তাম্রমুদ্রা নিক্ষেপ করিতে শিখিয়াছেন এবং শূন্যে প্রণাম ঠুকিয়া মনে মনে বলেন, হে মা বিশালাক্ষি, এ যাত্রা রক্ষা কর, যেন বাড়ী গিয়া গৃহিণীর মুখচন্দ্র দেখিতে পাই, আবার যখন এখান দিয়া যাইব তোমার জন্য আবার এমনি করিয়া পয়সা ফেলিয়া দিব। মুসলমানের দেখাদেখি অনেক জায়গায় ব্রাহ্মণেরা সিন্নি দিয়া পীরকে সন্তুষ্ট রাখেন। এ সকল দেবতা উপদেবতা যে ব্রাহ্মণধর্ম্মপ্রসূত নহে তাহা ত আর চোখে আঙুল দিয়া বুঝাইতে হইবে না। এবং ইহা হইতেই হিন্দুধর্ম্মগঠনে নিম্নশ্রেণীর প্রভাবের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

প্রাচীন ব্রাহ্মণেরা সমগ্র ভারতবর্ষকে এক সংহত ধর্ম্মগঠনে এক করিতে চেষ্টা করেন নাই—তাঁহারা আপনমনে ধ্যানধারণা করিতেন এবং আপন উন্নত আদর্শে আপনাকে গঠিত করিতেন। ভারতবর্ষের জনসাধারণ সে আদর্শে কখনও পৌঁছে নাই, এবং সাধারণের পক্ষে সে আদর্শ দুর্গম বুঝিয়া ব্রাহ্মণেরা সাধারণকে সে বিষয়ে উপদেশও দিতেন না। জ্ঞানধর্ম্মে অগ্র-

সর বলিয়া সমাজে তাঁহাদের প্রাধান্য সহজেই প্রতিষ্ঠিত হয়। কালক্রমে ব্রাহ্মণের সংখ্যা যখন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল এবং ব্রহ্মণ্য জ্ঞানের সহিত সর্ব্বত্র যোগ রক্ষা করিতে পারিল না, তখন সহস্র প্রচলিত ধর্ম্মকর্ম্মের সহিত জড়িত হইয়া বংশগুণে ব্রাহ্মণই সেইসকল ধর্ম্মানুষ্ঠানের কর্তৃত্ব লাভ করিলেন। এই পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণের প্রভাব। নহিলে, ব্রাহ্মণধর্ম্ম সাধারণ্যে কখনও প্রচলিত হয় নাই—এবং ব্রাহ্মণের প্রভাব ঠিক খৃষ্টান পাদ্রীর মত নহে। বংশগৌরবে দেবত্বের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতা এবং ইহা হইতেই তাঁহার অমর প্রভাব।

কিন্তু এ কথা মানিতে হয় যে, আমাদের দেশের সর্ব্বসাধারণের মধ্যে ধর্ম্মভাব প্রচারের মূল ব্রাহ্মণ। এবং সাধারণের প্রভাব যেমন ব্রাহ্মণকে স্পর্শ করিয়াছে ব্রাহ্মণের প্রভাব তেমনি সাধারণের ধর্ম্মকে অনেক পরিমাণে গঠন দিয়াছে। কিন্তু ব্রাহ্মণধর্ম্মের সহিত হিন্দুধর্ম্মের যোগ ঠিক কোন্খানটায় এবং বিচ্ছেদই বা কোথায় এখন নির্ণয় করা কঠিন। কালসহকারে ব্রাহ্মণের অবস্থা পরিবর্ত্তনের সহিত ধর্ম্মও ক্রমে ক্রমে অল্পে অল্পে নিঃশব্দে পরিবর্ত্তিত হইয়া আসে এবং প্রচলিত সহস্র সংস্কার আত্মসাৎ ও পরিপুষ্ট করে। সাধারণের মধ্যে ধর্ম্মহীনতা আশঙ্কায় ব্রাহ্মণেরা মধ্যে মধ্যে তাঁহাদের উচ্চ লক্ষ্য হইতে নামিয়া আসিয়া সাধারণের উপযোগী অনেক ব্যবস্থাও করিয়াছেন। এবং সে সকল বিধি ব্যবস্থা তাঁহাদের নিজের উপরেও ফলিয়াছে। বলা বাহুল্য, ইহা হিন্দুধর্ম্মেরই অঙ্গ। হিন্দুধর্ম্ম সকলই;—ব্রাহ্মণেতর নানাবিধ উপধর্ম্মের সহিত ব্রাহ্মণধর্ম্মের সম্মিশ্রণ হিন্দুধর্ম্ম; অমিশ্র বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণধর্ম্মও হিন্দুধর্ম্ম; এবং যে সকল অপধর্ম্ম ব্রাহ্মণধর্ম্মের ছায়াও মাড়ায় নাই তাহাও

হিন্দুধর্ম্ম। সুতরাং ব্রাহ্মণধর্ম্ম এবং হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে রেখা টানা চলে না।

কিন্তু হিন্দুধর্ম্মের প্রকৃতি কি, তাহা এতক্ষণে বোধ করি কতকটা পরিস্ফুট হইয়াছে। এবং কোনপ্রকার শৃঙ্খলার যে এখানে কিরূপ অভাব তাহা বুঝিতেও কাহারো বড় বাকি নাই। হিন্দু দেবচরিত্র আলোচনা করিলে এ অভাব আরও সুস্পষ্ট চোখে পড়ে। তেত্রিশ কোটির অধিক দেবতা হইলেও একই দেবচরিত্রের এরূপ অসঙ্গত বিরোধী বর্ণনা দেখা যায় যে, তাহার মধ্যে সামঞ্জস্য বাহির করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। এবং একই দেবতার নানা বিরোধী উপাসকসম্প্রদায়ের মধ্যে কোন-প্রকার নৈতিক একতা পর্য্যন্ত দেখা যায় না। এক কৃষ্ণকে কতজনে কতভাবে দেখে—কেহ রূপকহিসাবে, কেহ অবতার-হিসাবে, কেহ পূর্ণব্রহ্মহিসাবে, কেহ আদর্শ মনুষ্যহিসাবে; এবং এই হিসাবানুসারে ভিন্ন ভিন্ন লোকের উপর তাঁহার ভিন্ন ভিন্ন প্রভাব। কৃষ্ণলীলা যাহারা কেবলমাত্র রূপকহিসাবে গ্রহণ করে এবং যাহারা ইহার পার্থিব অনুকরণকেই মুক্তির পরম পথ বলিয়া নির্দ্দেশ করে তাহাদের উভয়ের মধ্যে নীতিবিষয়ে ঐক্য হইবার কথাও নয়। কৃষ্ণের নামের চারিদিকে নানা রসের গল্প জুটিয়াছে—এই সকল গল্পের নায়করূপে তিনি ভিন্ন ভিন্ন উপাসক সম্প্রদায়ের নীতি গঠন করেন। মহাদেবও একদিকে অসাধারণ সংযমী যোগীপুরুষ—ভোগসুখের মূর্ত্তিমান্ প্রতিবাদ; অন্যত্র নেশাখোর লক্ষ্মীছাড়া এবং কুচনীপাড়ার সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। সুতরাং এক মহাদেবের দুইরূপ সম্পূর্ণ বিপরীত নৈতিক প্রভাব। আধ্যাত্মিক এবং পার্থিব উভয় ভাবে এই সকল দেবচরিত্রের কিরূপ প্রভাব যাঁহারা জানিতে ইচ্ছা করেন,

বাবু অক্ষয়কুমার দত্তের ভারতবর্ষীয় উপাসকসম্প্রদায় নামক গ্রন্থ পাঠ করিলেই সবিশেষ বিবরণ অবগত হইবেন। আর মিথ্যাচরণে কাপট্যাবলম্বনে এবং যথেচ্ছাচারিতায় আমাদের দেবগণ কিরূপ পটু তাহার প্রমাণ আবশ্যক হইলে সংস্কৃত পুরাণাদি হইতে আরম্ভ করিয়া বাঙ্গালা কবিকঙ্কণ চণ্ডী, মনসার ভাসান এবং অন্নদামঙ্গল পর্য্যন্ত রাশীকৃত গ্রন্থের উপর নিশ্চিন্ত মনে বরাত দেওয়া যাইতে পারে। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে ত দেব-চরিত্র চরিত্রহীনতার আদর্শ। এবং নবাবী যথেচ্ছাচারিতাই দেবতাদিগের ক্ষমতার একমাত্র পরিচয়। সুতরাং শাস্ত্রবিধি যতই সংযম সাধনের উপদেশ দিয়া মরুক্ না কেন, এইসকল প্রবল আদর্শ আমাদিগকে সংযমসাধনের পথ হইতে নিরাপদ দূরে রাখিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে।

ধর্ম্মের এইরূপ বহুরূপী বিশৃঙ্খলা বোধ করি অনেকাংশে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অনৈক্যের সহিত জড়িত। এক বৃহৎ সংহত শাসনতন্ত্রের অধীনে সমস্ত দেশ যখন দীর্ঘকাল নিরবচ্ছিন্ন শান্তিসুখ ভোগ করিবার অবসর পায় তখনই প্রায় ধর্ম্ম লইয়া জাতির হৃদয়ে একটা আন্দোলন উঠে এবং সুবৃহৎ সংহত ধর্ম্ম-গঠনের এই সময়। নহিলে, চতুর্দ্দিকের অশান্তি উপদ্রবে লোকের মন যখন নিতান্ত বিক্ষিপ্ত থাকে তখন সুশৃঙ্খলে গঠনকার্য্য সুসম্পন্ন হওয়া কঠিন। রাজনৈতিক অবস্থার সহিত জাতীয় ধর্ম্মসংগঠনের এরূপ ঘনিষ্ঠ যোগ প্রথম দৃষ্টিতে কেমন অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু ইহার অনুকূলে যখন রীতিমত ঐতি-হাসিক প্রমাণ পাওয়া যায় তখন আর এ যোগ সম্বন্ধে সংশয় থাকে না। খৃষ্টধর্ম্মের আবির্ভাবের পূর্ব্বে রাজনৈতিক অশান্তির সহিত রোমের ধর্ম্মনৈতিক অবস্থাও বিশৃঙ্খল ছিল—আমাদেরই

মত নানা দেবতা উপদেবতা, কোনটির সহিত কোনটির বড় ঐক্য নাই, রোমানেরা মনের নানা প্রবৃত্তিকে দেবতার পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া পূজা করিত, ভাল মন্দ বিচার ছিল না, স্বর্গ নরক গায়ে গায়ে, মুড়ি মিছরি একদর। রাজনৈতিক শান্তি এবং খৃষ্টীয় ধর্ম্মগঠন প্রায় একসঙ্গেই আসে। আমাদের দেশেও সম্প্রতি ইংরাজশাসনের শান্তিতে জাতীয় ধর্ম্মগঠনের ভাবের অঙ্কুর গজাইয়া উঠিয়াছে। এবং প্রাচীনকালেও আমাদের অদৃষ্টে একবার এই শুভ অবসর জুটিয়াছিল। অশোক তখন ভারতবর্ষের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত—তাঁহার প্রবল প্রতাপে সমস্ত ভারত এক-ছত্র। রাজনৈতিক অবস্থা শান্তিময় এবং জাতীয় ধর্ম্মগঠনের অনুকূল। তাহাতে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের ধর্ম্ম এবং অশোক একজন পরম বৌদ্ধ। অল্পদিন মধ্যে হুহু করিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম দেশময় ছড়াইয়া পড়িল। কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্ম ভাল করিয়া আমাদের মজ্জার মধ্যে বসে নাই—বসিবার অবসর পায় নাই। ভারতবর্ষ বহু-দিন একছত্র রহিল না এবং বৌদ্ধধর্ম্ম দেশান্তরিত হইয়া গেল। শিথিল ভারতবর্ষীয় প্রকৃতি বৌদ্ধ আন্দোলনের বৃহৎ সংহত সুশৃঙ্খলা হইতে মুক্তিলাভ করিয়া আবার ছোটখাট রাজ্য উপ-রাজ্য এবং অনির্দ্দিষ্ট সহস্র বিশ্বাস উপবিশ্বাসের অরাজকতায় সান্ত্বনা লাভ করিল।

এই অরাজক অবসরে চারিদিক হইতে যে নূতন বহুরূপী ধর্ম্মের আবির্ভাব হইল তাহাই এই নব্য হিন্দুধর্ম্মের জননী। এবং সেই অবধি হিন্দুধর্ম্ম একটা প্রকাণ্ড নিবিড় জঙ্গল—যেখানে যেমন সুবিধা পাইয়াছে নানা রকমের গাছপালা এবং আগাছা সমভাবে গজাইয়া উঠিয়াছে। গাছে আগাছায় বন ঢাকা—কোথাও পথ দেখা যায় না—এবং এতদিন পথের সন্ধানও কেহ

করে নাই। সূর্য্যালোক নাই—দিক্‌নির্ণয়শলাকা নাই—ঘন বনের মধ্য দিয়া অন্ধকারে হাতড়াইয়া আর কত পথ বাহির হইবে? এখন ইংরাজী শিক্ষার প্রসাদে আমাদের মনে যে নূতন স্বাধীনতা ও সংহত ঐক্যের ভাব আসিয়াছে ইহাদ্বারাই যদি কালে এই বিপুল ধর্ম্মজঙ্গল পরিষ্কার হয়—এবং এই ঘন নিবিড় বনানীর মধ্য দিয়া কোন নূতন পথ বাহির হয়—সেই একমাত্র ভরসা।

বঙ্কিমচন্দ্র।

হিন্দুর এ হীন গৃহ চির স্বর্গময়
হিন্দু রমণীর যেই নিষ্কাম জীবনে,
আজীবন পালে হেথা রমণীহৃদয়
যে নিত্য সাবিত্রী-ব্রত পতির চরণে,
কবিতার আদি গুরু অমর ভাষায়
যে পরম নারীধর্ম্ম শুনাল ধরায়,
সেই অমৃতের ছবি আঁকি পুনরায়
ঘরে ঘরে ও লেখনী অমৃত বিলায়;
বিষবৃক্ষ মাঝে চির অমৃতবল্লরী
তোমার ও সূর্য্যমুখী যেন মূর্ত্তিমতী
পতিসেবা, কায়মনে বিক্রীত কিঙ্করী
পতিদেব-দেবালয়ে, পতি মুক্তি গতি;
পতি-ব্রহ্মচর্য্য ব্রতে পতি-সন্ন্যাসিনী
পবিত্র এ গৃহাশ্রমে হিন্দুর রমণী।

৭৯৮

সাময়িক সারসংগ্রহ।

সচেতন ও অচেতন আত্মা।

শরীর ও মনের পরস্পরের সহিত যোগাযোগ নির্ণয় করিতে গিয়া অনেক পণ্ডিত অনেক প্রকার কথা বলিয়াছেন। আধুনিক দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে সকল বিষয়েই একত্ববাদ উত্তরোত্তর অধিকতর প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছে বলিয়া মনে হয়। উপস্থিত বিষয় সম্বন্ধে একত্ববাদীদিগের মোট কথা এই যে, শরীর ও মন ভিন্ন পদার্থ নহে, উহারা এক—কেবল এ-পিঠ ও-পিঠ মাত্র। একই পদার্থকে এক দিক দিয়া দেখিতে গেলে আমরা বস্তু বলি, অপর দিক দিয়া দেখিতে গেলে মন বলি। এইরূপ অনুমানের সহিত কাহারও বিবাদ না থাকিতে পারে, কিন্তু ইহাতে শরীর মনের সম্বন্ধ মনে ধারণা করিবার যে বিশেষ কোন সহায়তা হইল তাহা বলা যায় না। এমন কি, প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিকগণ, যাঁহারা বিশ্বের সকল বিষয়েই সম্বন্ধ বাহির করিতে ভালবাসেন, তাঁহারাও এইরূপ সম্বন্ধ নির্ণয়ে বড় নারাজ। টিণ্ডাল বলিয়াছেন যে, বস্তু ও মনের যোগাযোগের যথার্থ স্বরূপ নির্দ্দেশ করিবার চেষ্টা করা বৃথা। সম্বন্ধ যে আছে তাহা প্রত্যক্ষ, কিন্তু যোগবন্ধনটি কি প্রকারের আমরা কিছুই জানি না। অবশেষে তিনি এতদূর পর্য্যন্ত বলিয়াছেন যে অতি প্রাচীন দার্শনিকদিগের সময়ে এই রহস্যটি যেরূপ দুর্ভেদ্য ছিল এখনও ঠিক তদ্রূপ। হক্স্‌লি বলিয়াছেন যে আলাদিনের প্রদীপ ঘর্ষণে জিনের আবির্ভাব এবং ভৌতিক পরমাণুর কম্পন হইতে মনের উৎপত্তি দুই সমান আশ্চর্য্য ও দুর্ব্বোধ্য। কিন্তু মনিষ্ট পত্রিকার বর্ত্তমান প্রবন্ধ লেখক ফ্রান্সিস্‌ রাসেল এইরূপ নৈরাশ্যের কারণ

দেখিতেছেন না। তিনি বলিতেছেন যে আজকাল দর্শন বিজ্ঞানাদি শাস্ত্রসকলের যেরূপ উন্নতি দেখা যাইতেছে তাহাতে আমাদের কিঞ্চিৎ আশার সঞ্চার হইবার কথা।

যাহা জানা আছে তাহার সহিত অজানা বিষয়ের কোনরূপ তুলনা করিতে পারিলে—কোন প্রকার সাদৃশ্য কল্পনা করিতে পারিলে তবেই উহাকে ধারণা করিবার সুবিধা হয়, এতদ্ভিন্ন অন্য উপায়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত বিষয়কে আমাদের আয়ত্ত করিবার কোনও সম্ভাবনা নাই। লেখক মহাশয়, বর্ত্তমান প্রবন্ধে, নূতন তত্ত্বানুসন্ধানের এই প্রথম সোপানের উর্দ্ধে উঠিতেছেন না। তিনি তাড়িৎশক্তির উৎপত্তি সম্বন্ধে প্রচলিত অনুমানের সহিত বস্তু এবং মনের একটি তুলনা দিয়া, বস্তুর ক্রিয়া দ্বারা মনের প্রকাশ সম্বন্ধে আমাদের স্পষ্টরূপ ধারণা করাইবার চেষ্টা করিতেছেন।

এতদিন তাড়িৎ ও চৌম্বক শক্তির প্রকৃতি সম্বন্ধে কোন বিশেষ মত প্রচলিত ছিল না। ইহারা যে, পরমাণুর চালনা-উদ্ভূত তাহা বহু পূর্ব্বেকার তাড়িৎযন্ত্র দেখিলেও বুঝা যায়, কিন্তু তখন ইহার অধিক কেহ জানিত না। সম্প্রতি ভৌতিক পরমাণু বিকম্পনের সহিত তাড়িৎশক্তির সম্বন্ধ কি প্রকারের তাহা অনুমিত হইয়াছে এবং এই অনুমান সম্বন্ধে সকল খ্যাতনামা পণ্ডিত এক মত। কিছুকাল হইল অধ্যাপক লজ্ এই বিষয়ে এক নূতন পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে তিনি বলিয়াছেন যে তাড়িৎ ও চৌম্বক শক্তি যে, সর্ব্বব্যাপী ঈথরেরই ক্রিয়াবিশেষ তাহাতে কোনও বৈজ্ঞানিকের আর সন্দেহ থাকিতে পারে না। পরে তিনি আরও সূক্ষ্মরূপে ঈথরের তাড়িতাবস্থার বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন যে ঈথরের দুই বিপরীত গুণ-বিশিষ্ট উপাদান

আছে। ইহারা যতক্ষণ একত্রে থাকে ততক্ষণ কোনপ্রকার ইন্দ্রিয়গোচর চিহ্ন দ্বারা স্বীয় অস্তিত্ব জ্ঞাপন করে না। কিন্তু যদি কোন উপায়ে—যথা কোন বস্তুর পরমাণু চালনদ্বারা—ঈথরের এই দুই উপাদানকে পৃথক্ করা যায় তাহা হইলে ইহারা পরস্পরের প্রতি গমনেচ্ছা প্রভৃতি কতকগুলি লক্ষণদ্বারা তাড়িৎশক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করে।

এই ত গেল বিজ্ঞানের কথা। ইহার সত্যমিথ্যার সহিত বর্ত্তমান প্রবন্ধের বড় সম্পর্ক নাই। কিন্তু ইহা অবলম্বন করিয়া বস্তুর সাহায্যে মনের কি উপায়ে প্রকাশ হইতে পারে তাহার একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

ঈথর যেমন সর্ব্বব্যাপী তেমনি একটি সর্ব্বব্যাপী আত্মা বিশ্বের সহিত ওতপ্রোত হইয়া আছে। এই আত্মার দুই উপাদান অনুভূতি এবং ইচ্ছাবৃত্তি। এই দুই উপাদান যখন এক হইয়া থাকে তখন পরস্পরকে তৃপ্ত রাখে—কোনরূপ চেতনার উদ্রেক হয় না, কিন্তু জীবিত স্নায়বীয় পদার্থের কম্পিত পরমাণুর সংস্পর্শে এই দুই উপাদান বিচ্ছিন্ন হইয়া পৃথক্ হইয়া পড়ে। এইরূপ অবস্থায় উহাদের যে মিলনেচ্ছা জন্মে তাহাকে আমরা চেতনা বলিয়া অনুভব করি। উপাদানদ্বয়ের ন্যূনাধিক বিচ্ছেদে চেতনার তারতম্য আমরা প্রতিদিনকার ছোট ঘটনায় দেখিতে পাইতে পারি। আমাদের যে সময়ে কোনরূপ ভাবনা চিন্তা নাই, আহার মনের মত হইয়াছে, শরীরের যেটুকু ক্লান্তি জন্মিয়াছে তাহা সুকোমল শয্যা এবং মৃদুমন্দ বাতাসে সম্পূর্ণ দূরীভূত হইতেছে, সে সময়ে আমরা সচেতন থাকি কি অচেতন থাকি বলা ভারি শক্ত। অপর পক্ষে যখন অবস্থা এইরূপ যে "পায়ে শিকলি, মন উড়ু উড়ু"—যে অবস্থা অনুভব করিতেছি বাসনা

তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে ছুটিতেছে তখন যে আমরা পূর্ণমাত্রায় সচেতন তাহা কে অস্বীকার করিবে?

মনিষ্টের লেখক মহাশয় ভরসা করিতেছেন যে জীবনের সকল অবস্থার সহিত মিলাইয়া পণ্ডিতগণ ইহাকে বা এইরূপ কোন সহজ-বোধ্য অনুমানকে যদি স্থির সিদ্ধান্তে পরিণত করিতে পারেন তাহা হইলে ভবিষ্যতে শরীর মনের যোগাযোগ সম্বন্ধে ভাবিতে গেলে কাহারও ধাঁদা লাগিয়া যাইবার কোন কারণ ঘটিবে না।

আধুনিক মস্তিষ্কতত্ত্ব ও ফ্রেণলজি।

আমাদিগের যেমন যুগল পদ, যুগল হস্ত, যুগল চক্ষু, যুগল কর্ণ, সেইরূপ আমাদিগের মস্তিষ্কও যুগল। মস্তকের অভ্যন্তরে মস্তিষ্ক দুই সমান অংশে বিভক্ত—একাংশ বিনষ্ট হইলেও অপরাংশে কাজ কথঞ্চিৎ চলিতে পারে। দুই অংশ অক্ষত থাকিলে কাজ যতটা ভাল রকমে চলে একটির দ্বারা অবশ্য সেরূপ চলিতে পারে না। সমস্ত মস্তিষ্কপিণ্ড একপ্রকার সাদা পদার্থে গঠিত; তাহার উপরিভাগে যেন একটা ধূসর পদার্থের পাত্‌লা প্রলেপ বিদ্যমান। মস্তিষ্কের এই ধূসর অংশ অনুবীক্ষণ যন্ত্রের দ্বারা পরীক্ষা করিয়া জানা যায় যে উহা বিচিত্র আকার-বিশিষ্ট স্নায়ু-কোষের সমষ্টি মাত্র; ঐ প্রত্যেক স্নায়ু-কোষের সহিত দুই চারিটি করিয়া সূক্ষ্ম স্নায়ু-সূত্র সংযুক্ত এবং অভ্যন্তরস্থ শুভ্র পদার্থটি নিরবচ্ছিন্ন স্নায়ু-সূত্রের সমষ্টি ভিন্ন আর কিছুই নহে। এই স্নায়ু-কোষ ও স্নায়ু-সূত্র অতি সূক্ষ্ম ও উহাদের জাল-বিস্তার অতীব জটিল। এই স্নায়ু-কোষগুলি একপ্রকার শক্তির আধার-